কুড়ানো মুক্তা

মুফ্‌তী জালালুদ্দিন মিয়াজি



কুড়ানো মুক্তা

[১]

সংকলক

মুফতি জালালুদ্দীন মিয়াজী

মুহাদ্দিস, জামেয়া মাদানিয়া নিমতলি, ঢাকা

খতিব, নূর মসজিদ বেগমগঞ্জ লেন, ধোলাইখাল, ঢাকা

টেলিগ্রাম চ্যানেল লিংক

https://t.me/islaMic_fdf

মাহমুদিয়া লাইব্রেরী

১১/১, ইসলামী টাওয়ার, বাংলা বাজার, ঢাকা।

কুড়ানো মুক্তা [১]

লেখক : **মুফতি জালালুদ্দীন মিয়াজী**
মুহাদ্দিস জামেয়া মাদানিয়া, নিমতলি, ঢাকা।

প্রকাশক : মাওলানা হাবীবুর রহমান
মাহমুদিয়া লাইব্রেরী
১১/১, ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা।
মোবাইল- ০১৯৩৮ ০২২০৭৯

প্রথম প্রকাশ : জুন ২০০৬ঈসায়ী

প্রথম সংস্করণ : অক্টোবর ২০১৮ ঈসায়ী

গ্রন্থস্বত্ব : প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

বর্ণ বিন্যাস : **নাবিল কম্পিউটার**
মাদরাসা সাবিলুর রাশাদ, হাজারীবাগ, ঢাকা।
মোবাইল : ০১৭৪০ ৭০৫৭০৩,০১৯১২ ৪৩৭৪৬৯

মূল্য ঃ ১৬০/-

প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ, মুজাহিদে মিল্লাত, বাতিলের আতঙ্ক
ঐতিহ্যবাহী জামেয়া কোরআনিয়া আরাবিয়া লালবাগ
মাদ্‌রাসার শায়খুল হাদীস ও প্রিন্সিপাল আল্লামা হযরত
মুফতী ফজলুল হক আমিনী রহ. (এম.পি) এর

অভিমত ও দোয়া

ছোট্ট একটি ঘটনা মানব জীবনে ঘটাতে পারে আমূল পরিবর্তন। আলোকিত মনীষীদের উজ্জ্বল ঘটনা পাঠে মানুষ নিজেকে আলোকিত করতে পারে। পথ চলার দিক নির্দেশ খুঁজে পায়। এমনই কিছু আলোকিত মানুষের অনুস্বরণীয় ঘটনা সম্বলিত বই প্রকাশ হচ্ছে শুনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। একবিংশ শতাব্দীর স্যাটেলাইটের এই যুগে এই বই মানুষকে অনেকাংশে ইসলামের পথে অনুপ্রাণিত করবে বলে আমার বিশ্বাস।

আমার স্নেহপদ মুফতী জালালুদ্দিন সংকলিত এই বইটির সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করছি। আর দোয়া করছি মহান আল্লাহ তায়ালা বই এবং এর সংকলকে কবুল করুন এবং আরো অধিক পরিমাণে দ্বীনি খেদমত তাওফিক দান করুন। আমীন!

মুফতী ফজলুল হক আমিনী রহ.
প্রিন্সিপাল ও শায়খুল হাদীস
জামেয়া কোরআনিয়া আরাবিয়া লালবাগ
সাবেক এম পি, জাতীয় সংসদ সদস্য
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জাতীয় মসজিদ বায়তুল মুকাররম এর সাবেক সম্মানিত খতীব
আলহাজ্ব হযরত মাওলানা ওবায়দুল হক সাহেব রহ.-এর

অভিমত ও দোয়া

মৌলভী মোহাম্মাদ জালালুদ্দিন সংকলিত 'কুড়ানো মুক্তা' নামক গ্রন্থটি প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি খুবই আনন্দিত হলাম। বইটির বিষয়গুলো আধুনিক যুব সমাজের চরিত্র গঠনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। বইটি আমাদের সকলের জন্য বিশেষ করে আলেম-ওলামা, তালেবে ইলেম, দ্বীন প্রচারকগণ এর দ্বারা উপকৃত হবেন। আমি তার এই বইটির সফলতা কামনা করি।

মাওলানা উবায়দুল হক রহ.
সাবেক খতিব
বায়তুল মুকাররম জাতীয় মসজিদ
ঢাকা।

প্রকাশকের অভিমত

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহ তায়ালার জন্য, সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক হযরত মুহাম্মাদ সা.-এর ওপর। যাঁর অশেষ রহমতে কুড়ানো মুক্তা নামক বইটি পাঠকদের হাতে তুলে দিতে সক্ষম হচ্ছি।

পৃথিবী জুড়ে ইসলাম বিরোধী মিডিয়ার আগ্রাসানে মুসলিম উম্মাহ যখন নিজস্ব গতি হতে হারিয়ে যাচ্ছে, এমনই মুহূর্তে আলী মিঞার একটি কথা নিজেকে ব্যথিত করছে যে, 'ওরা লেখবে তোমরা পড়বে এ অবস্থা কিছুতেই বরদাশত করা উচিত নয়'। কথাটির বাস্তবতা খুঁজে দেখি যে আমাদের সাহিত্যঙ্গনে ছড়িয়ে আছে মিথ্যা গল্প কাহিনী। আর যুব সমাজকে নষ্ট করার অরুচিকর লেখা। যা যুব সমাজকে একেবারে পর্যদুস্ত করে ফেলছে। তাই সিদ্ধান্ত নিলাম কোরআন হাদিসের কিছু কাহিনি দিয়ে একটি বই প্রকাশ করবো। যা দ্বারা যুবকদের আখলাক-চরিত্র, সুন্দরভাবে গড়ে উঠবে। এজন্য মুফতি জালালুদ্দিনকে বারবার তাগাদা করি কাজটি দ্রুত করার জন্য। শত ব্যস্ততার মাঝে সময় দিয়ে অনেক সহযোগিতা করেছেন। আল্লাহ তায়ালা তাঁকে উত্তম বিনিময় দান করুন। আর আমাদের এ প্রচেষ্টাকে কবুল করুন। আমীন!!!

--- মাওলানা হাবীবুর রাহমান

লেখকের কথা

الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى امابعد

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার জন্য, যিনি মানব জাতিকে সমস্ত সৃষ্টির উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন এবং তাদেরকে দেখিয়েছেন সিরাতে মুস্তাকিম বা সহজ সরল সঠিক পথ। যার মাধ্যম মানুষ পেতে পারে জাহান্নাম থেকে মুক্তি ও জান্নাতে অনাবিল শান্তি। আর সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক খাতামুন নাবিয়্যিন হযরত মুহাম্মদ সা. এর উপর। যাঁর অক্লান্ত পরিশ্রম শান্তির ঝর্ণাধারা সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছিল। বিপদগামী জাতি পেয়েছে সঠিক পথের সন্ধান,সমৃদ্ধি, শখ্যতা, হৃদ্যতা, ভালবাসা, দয়াতা, মায়াতা। রহমত নাযিল হোক তাঁর সাহাবায়ে কেরাম ও তাঁর পরিবার পরিজনের উপর। যাঁদের আত্মত্যাগও নিঃস্বার্থ কুরবানির বদৌলতে আজ আমরা মুসলমান হিসাবে পরিচয় দিতে গর্ববোধ করি।

আজ আমরা খুব পরিতাপের সাথে লক্ষ্য করছি যে, নতুন শতাব্দীর স্যাটেলাইট আর মিডিয়ার আগ্রাসনের অপ্রতিরোধ্য স্রোতে ভেসে যাচ্ছে আমাদের সুন্দর সাহিত্য।

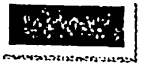
বিধর্মীদের সংঘবদ্ধ একটি দল মুসলমানদের ঈমান আকিদাকে ধ্বংস করার জন্য বিভিন্ন অনৈসলামিক বইপত্র এবং উপন্যাস ছলে বলে কলে কৌশলে তাদের হাতে তুলে দিচ্ছে যা তাদের ঈমান আকিদাকে কুরে কুরে খাচ্ছে, বিশেষ করে যুব সমাজ সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

তাই আকাবেরদের জবান থেকে শ্রুতিতে এবং বিভিন্ন কিতাব থেকে সংগৃহিত তাদের সার্থকময় জীবন পরিসরে রেখে যাওয়া নানা উপদেশমূলক ও অনুস্বরনীয় ঘটনা মুক্তার ন্যায় অমুল্য সম্পদ জ্ঞান পিপাসু বাংলা ভাষা ভাষিদের সামনে একত্রিত করে তুলে ধরার উচ্চাসিত আবেগ ও হৃদয়ের গভীরে লালিত বাসনা নিয়ে এই সংকলনের অবতারণা। তাই আশা করি যদি এসব ঘটনাবলী দ্বারা ঘুনে ধরা সমাজে কিছুটা পরিবর্তন আসে এবং একটি ঘটনাও যদি পাঠকদের হৃদয়ে রেখাপাত করে তবে এই অধমের শ্রম স্বার্থক বলে মনে হবে।

অপরাধির অপরাধ স্বীকার করার মধ্যে রয়েছে তার মুক্তি। তাই নিজের অপরাধকে স্বীকার করে পাঠকদের খেদমতে বিনয়ের সাথে আরজ করতে চাই আমি লেখার জগতে একজন নবীন ছাত্র বিধায় ভুল ত্রুটি হওয়া স্বাভাবিক। আশা করি পাঠক তা ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখবেন।

পরিশেষে যারা আমাকে এই ব্যাপারে সহায়তা করছেন, বিশেষ করে মাওলানা খালেদ মুশাররফ ও আমার প্রিয় ছাত্রদের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আল্লাহ আমাদেরকে সকলকে উত্তম প্রতিদান দান করুন। আমীন!!!

–মুফতী জালালুদ্দিন



উৎসর্গ

আমার সাফল্য কামনা করে যাদের জবান থেকে বেরিয়ে আসে হৃদয়
নিংড়ানো দোআ সে আমার পিতা-মাতার হায়াত দারাজের উদ্দেশ্য এবং
আমার আসাতেজায়ে কেরামের দরজাত বুলন্দের জন্য।
যাদের যোগ্য তরবিয়তে বদৌলতে আল্লাহ তায়ালা
এই অধমকে দু'একটি কথা বলা ও লেখার
তাওফীক দান করেছেন।

----- সংকলক

উপহার

কুড়ানো মুক্তা [১] বইটি

আমার শ্রদ্ধেয়/স্নেহময় .....

.....

..... কে

স্মৃতিস্বরূপ উপহার দিলাম।

হিতকামী

স্বাক্ষর : ..... তারিখ : .....

মোবাইল : .....

সূচিপত্র

একজন সতী নারী/১৩
হযরত খাদিজা রাযি. এর সফল পরীক্ষা/১৭
মুর্খের শিক্ষা/১৮
যে যায় সে আসে না/১৮
১৩শ বছর পর দুইজন সম্মানিত সাহাবী রা.-এর
লাশ অক্ষত অবস্থায় স্থানান্তর/১৯
মরণের ভয়/২২
নাসির গাজীর ঝুলি/২৪
অহংকারের পরিণতি/২৬
একেই বলে লজ্জা/২৭
কাবা ঘরের গিলাফের সম্মানে/২৮
ইব্রাহীম আ.-এর মেহমান/২৮
মনে মনে রাগ-মনে মনে ক্ষমা/২৯
আমি কেন মুসলমান হলাম?/৩০
দোষ তালাশ করার অদ্ভুত পদ্ধতি/৩২
শয়তানের জায়গায় আমার নাম
ফেরআউনের জায়গায় বাপের নাম/৩৪
আতর নিয়ে বিপাকে/৩৫
সকলের প্রিয় বস্তু তিনটি/৩৬
মুক্তির আজব কৌশল/৩৮
ঢাকনা নিয়ে টানাটানি/৪০
সৎমায়ের আদরের রহস্য/৪১
হযরত মূসা আ. ও হযরত খিজির আ./৪২
মূর্তিপূজারির ঘটনা/৪৭

সূচিপত্র

ঘুষ খাওয়ার কৌশল/৪৮
বানরের ডাক্তারি শক্তি/৫২
আল্লামা ইবনে সা'নার ঘটনা/৫৪
পাঁচ আঙ্গুলের ব্যাখ্যা/৫৫
চোগলখোরীর পরিণাম/৫৭
পাঁচ কবরের ঘটনা/৫৯
আপনার হাত মধুর পাত্রে আমার হাত
পায়খানার পাত্রে/৬১
উস্তাদজীর কান্না/৬৪
হেরে গেলো নাস্তিক/৬৫
হযরত উমর রা. এর চিঠি নীলনদীর বরাবর/৬৮নবীর স্বপ্ন/৬৯
চোখ জ্বলে যায়/৭১
আল্লাহর বরাবর চিঠি/৭২
যে আপনাকে আসতে দেয় না
সে আমাকে যেতে দেয় না/৭৪
হেরে গেলেন নানা জিতে গেলেন নাতী/৭৫
তর্ক যুদ্ধের বিজয়ী সম্রাট/৭৬
খোদায়ী ফায়সালা/৭৮
তিন তরিকার এক তরিকা/৭৯
তুমি শুধু উটের কেনা মূল্যেরই হকদার/৮২
হজ্বে না গিয়ে ও হজ্ব কবুল হওয়ার চমৎকার ঘটনা/৮৩
সোনালী যুগের রমজান মাসের ঘটনা/৮৫
জটিল মাসআলার সহজ সমাধান/৮৬
আমার কাছে একবার ক্ষমা চাইলে

সূচিপত্র

আমি ক্ষমা করে দিতাম/৮৭
আব্দুল্লাহ উন্দুলুসীর ঘটনা/৮৯
কুকুর প্রভু ভক্তির এক আজীব ঘটনা/৯৮
কুকুরের ভাল গুণ কি কি?/১০১
তার প্রেমিক আমাকে মেরেছে,
আমার প্রেমিক তাকে মেরেছে/১০২
বালআম বিন বা'উরার ঘটনা/১০৩
আমার অপরাধ একটি আপনার
অপরাধ কয়েকটি/১০৫
সব সমাস্যার এক সমাধান/১০৬
লাশ পরিবর্তন/১০৭
একেই বলে আশেকে রাসূল
হযরত আদম আ.-এর ৫টি উপদেশ/১১০
দুই জাহান্নামীর কান্ড/১১১
দাঁড়িওয়ালা নবী ১১জন স্ত্রী পেলে
আমি কি ১ জন ও পাব না?/১১২
দাঁড়ি না রাখলে ১৭টি ক্ষতি হয়/১১৫
বাদশার করুণ পরিণতি/১১৬
নির্জন বাস/১১৭
শিশু বুযুর্গ/১১৮
পূণ্যের পথে/১১৮

একজন সতী নারী

বর্ণিত আছে যে, বনি ইসরাইলের একজন ব্যবসায়ী হজ্বে যাওয়ার সময় তার স্ত্রীকে ছোট ভাইয়ের ঘরে রেখে যায়। ছোট ভাই ক'দিন পর (তার ভাবী) মহিলাকে তার সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার জন্য প্রস্তাব দেয়। মহিলা তার প্রস্তাবে অসম্মতি জানায়। সে অনেক অনুনয় ও জবরদস্তী করেও ঐ মহিলাকে অপকের্মে রাজী করাতে পারেনি। এদিকে শয়তানও সবসময় ছোট ভাইকে কুমন্ত্রণা দিয়েই যাচ্ছে। একদিন শয়তান মানুষ বেশে সে লোকটির কাছে এসে তাকে এভাবে প্ররোচিত করে যে, যদি মহিলা তার মনের চাহিদা মেটাতে রাজি না হয় তবে তার উপর যিনার অপবাদ আরোপ করবে এবং প্রস্তরাঘাত করে মৃত্যুদন্ড কার্যকর করার হুমকি প্রদান করবে।

শয়তানের প্ররোচনায় সে পুনরায় মহিলার নিকট কুর্কমের প্রস্তাব দেয়। এবং তার প্রস্তাবে রাজি না হলে তার পরিণতি যে ভয়াবহ হবে, সে কথাও তাকে জানিয়ে দেয়। কিন্তু তাতেও মহিলা রাজী হলো না। সুতরাং পাষণ্ড লোকটি মহিলার উপর ব্যভিচারের অপবাদ আরোপ করে এবং পাথর মেরে হত্যা করার জন্য লোকদের নির্দেশ দেয়। লোকেরা মহিলাকে নিয়ে দূরে এক জঙ্গলে গিয়ে প্রস্তরাঘাত করে এবং মহিলার মৃত্যু নিশ্চিত মনে করে জঙ্গলের এক পাশে ফেলে চলে আসে।

কিছুক্ষণ পর একজন পথিক জঙ্গলের পাশ দিয়ে হেটে যাচ্ছিল। সে জঙ্গল থেকে মানুষের কান্নার শব্দ শোনে নিকটে গিয়ে একজন মহিলার হাত-পা বাঁধা অবস্থায় দেখে শিহরোতি হয়ে উঠে। তখন সে হাতওপায়ের বন্ধন খুলে দিয়ে মহিলাটিকে তার গৃহে নিয়ে আসে। ঐ রাতে লোকটির ঘরে একজন মেহমানের আগমন হয়। মেহমান ঐ বিপদগ্রস্থ সুন্দরি মহিলাকে দেখামাত্রই তার উপর আসক্ত হয়ে পড়ে। রাতে বিপদগ্রস্থ সুন্দরি মহিলার পাশ্বে বাড়ীওয়ালার এক সুন্দরী যুবতী মেয়ে তাঁর সাথে ঘুমায়। এদিকে রাত যখন গভীর হয় এবং আশে পাশের লোকেরা গভীর নিদ্রায় বিভোর তখন লোলুপ্যমনা চরিত্রহীন মেহমান বিপদগ্রস্ত মহিলার ঘরে প্রবেশ করে তাকে চরিতার্থ করার জন্য ভুলক্রমে ঐ মহিলার পরিবর্তে গৃহস্বামীর যুবতী কন্যার উপর অপকামের জন্যে চড়াও হয়। কিন্তু অনেক চেষ্টার পরও যখন তাকে

কুকর্মের রাজি করাতে পারেনি, তখন উভয়ের মধ্যে দস্তাদস্তির এক পর্যায়ে মেহমান কন্যাটিকে চিনতে পারে। তখন সে গৃহস্বামীর যুবতী কন্যাকে হত্যা করে প্রত্যুষে ঘুম থেকে উঠে পালিয়ে গেল। গৃহস্বামী তার কন্যাকে মৃত অবস্থায় দেখে সে এবং তার স্ত্রী মনে করল যে, এ জঘন্যতম হত্যাকান্ডটি এ বিপদগ্রস্থ মহিলাটিই ঘটিয়েছে। বিবেকের অবচেতনায় প্রলুব্ধ হয়ে গৃহস্বামী ও তার স্ত্রী বিপদগ্রস্থ মহিলার উপর ক্রোধান্বিত হয়ে মহিলাটিকে মারপিট করে গৃহ থেকে বের করে দেয়। মহিলাটি ঘর থেকে বের হয়ে এক অজানা পথের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়।

সে বিষন্ন মনে হাঁটছিল আর নিজের অসহায়ত্বের কথা ভেবে মনে মনে আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করছিল। কিছু পথ অতিক্রম করার পর হঠাৎ সে দেখলো যে, জনৈক ব্যক্তি ঋণের টাকা পরিশোধ করতে অপরাগ হওয়ায় মালিক তাকে গুলিবিদ্ধ করতে প্রস্তুত। মহিলা লোকটির অসহায়ত্ব দেখে ঋণের টাকা শোধ করে তাকে মালিক থেকে মুক্ত করে দেয়। এতে লোকটি মহিলার নিকট অতিশয় কৃতজ্ঞ হয়ে পড়ে এবং তার বিনিময় হিসেবে সে মহিলার নিকট গোলাম হয়ে থাকার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করে। মহিলাও তাতে রাজী হল।

অত:পর মহিলা লোকটিকে সাথে নিয়ে চলল। পথিমধ্যে সমুদ্র পথে যাবার সময় জাহাজের একটি কক্ষে উভয়ই অবস্থান করে। হঠাৎ লোকটি কক্ষের মধ্যে মহিলার লাবন্যময় চেহারা দেখে ফেলে। অপরূপ চেহারা দেখে গোলাম মহিলার উপর আসক্ত হয়ে পড়ে এবং মহিলাকে কুকর্মে লিপ্ত করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালায়। কিন্তু মহিলা কিছুতেই তার প্রস্তাবে রাজি হয়নি। ঐ জাহাজে পাশের একটি কক্ষে অপর একজন বণিক সফরের উদ্দেশ্যে যাচ্ছিল। গোলাম মহিলাকে রাজি করাতে না পেরে ক্ষোভে জ্বলে উঠে এবং চক্রান্ত করে লোকটিকে বলে যে, তার নিকট একজন অতুলনিয় সুন্দরী দাসী আছে। সে ঐ দাসীকে বিক্রি করবে। বণিক লোকটি মহিলার রূপ লাবন্য দেখামাত্রই তার উপর আসক্ত হয়ে তাকে খরিদ করে নেয়। এবং তার সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার জন্য মহিলাকে বাধ্য করতে চেষ্টা করে। মহিলা অনেক অনুনয় বিনয় করে বলে যে সে দাসি নয়। বরং সে লোকটি তাকে

বাঁদী বলে বিক্রি করেছে সেই আমার কৃতদাস। আমি তাঁর ঋণের পয়সা শোধ করে তাকে গুলির সাজা থেকে মুক্ত করে এ পর্যন্ত এনেছি।

লোকটি মহিলার কথায় কর্ণপাত না করে নিজের আকঙ্খা পূর্ণ করার জন্য মহিলার উপর ঝাপিয়ে পড়ে। এমন সময় সমুদ্র থেকে হঠাৎ ঘুর্নিঝড় উঠে এবং জাহাজ সমুদ্রে ডুবে যায়। ঘটনাক্রমে মহিলাটি একটি কাঠের উপর বসে আল্লাহর ধ্যানে মগ্ন হল এবং সম্পূর্ণ সুস্থাবস্থায় সমুদ্রের পাড়ে অন্য একটি শহরে গিয়ে উঠল। এ দুর্ঘটনায় বহু লোক মারা যায়, কিন্তু জাহাজের ঐ বণিক লোকটি ও বেঁচে রইল।

মহিলা শহরে গিয়ে জানতে পারে যে,ঐ দেশের রাজা অত্যন্ত সৎলোক ও খোদাভীরু। মহিলা তখন রাজার নিকট উপস্থিত হয়ে তার উপর দিয়ে বয়ে যাওয়া সকল বিপদের কথা বর্ণনা করলো, বাদশাহ মহিলার কথাগুলো মনোযোগ সহকারে শুনেন এবং তাকে অতিশয় নেককার মনে করে শহরের উপকণ্ঠে তার ইবাদতের জন্য আলাদা একটি ঘর তৈরী করে দেন। মহিলা ঐ গৃহে অতি নির্জনে কায়মনোবাক্যে আল্লাহর ইবাদত বন্দেগীতে নিয়োজিত রইলেন।

কিছুদিন অতিবাহিত হওয়ার পর মহিলার দরবেশীর কথা দেশ ব্যাপি ছড়িয়ে পড়ল। লোকেরা দু:খ দুর্দশায় এবং রোগে তার নিকট দোয়া চাওয়ার জন্য আসতে লাগল। যে কেউ তার নিকট দোয়া চাইত সেই সফলকাম হত। এদিকে মহিলার স্বামী হজ্বব্রত পালন করে দেশে ফিরল। কিন্তু ঘরে তার স্ত্রীকে না পেয়ে ছোট ভাইকে জিজ্ঞাসা করল। ভাই উত্তরে বলল, তুমি হজ্জে চলে যাওয়ার পর তোমার স্ত্রী ব্যভিচারে লিপ্ত হয়েছিল। সুতরাং যিনার অপরাধে তাকে দন্ডিত করে পাথর মেরে হত্যা করা হয়েছে। তার সাথে মহল্লার একদল লোক ও সাক্ষ্য দিল। হাজী সাহেব ভাইয়ের উত্তরে শুনে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে চুপ করে রইলো।

কিছুদিন পর হাজী সাহেবের ভাইয়ের চোখ দু'টি অন্ধ হয়ে যায়। যারা সাক্ষ্য দেয় তারাও দৃষ্টিহীন হয়ে গেল। এ দিকে হাজী সাহেব পার্শ্ববর্তী দেশে জনৈক মহিলার দরবেশী ও দোয়া কবুল হওয়ার সংবাদ জানতে পারে। সুতরাং কাল বিলম্ব না করে তার ভাইকেসহ সকল অন্ধ লোকদের সাথে নিয়ে

ঐ দরবেশ মহিলার নিকট যাওয়ার জন্য যাত্রা করে । পথে যে লোকটি গৃহস্বামীর যুবতী কন্যাকে ঐ সুন্দরী মহিলা মনে করে রাতের অন্ধকারে হত্যা করেছিল তার সাথে দেখা হয়। সে অধহ রোগে মুমূর্ষ অবস্থায় ছিলো। সেও দোয়া নেয়ার জন্য যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিল। সুতরাং হাজী সাহেব সাথে তাকে নিয়ে নেয়। আর কিছু দূর যাওয়ার পর দেখা গেল যে, লোকটিকে ঋণ শোধ করে মৃত্যুর হাত হতে বাঁচিয়ে ছিল, সে ক্ষয় রোগ বা ক্যান্সার রোগে ভুগছে। সেও মহিলার নিকট রোগ মুক্তির জন্য যাওয়ার অপেক্ষা করছিল। হাজী সাহেব তাকেও সাথে নিল। সমুদ্র পার হয়ে হাজী সাহেবের সাথে একজন পঙ্গু লোকের সাক্ষাৎ হলো, সেও দোয়ার জন্য মহিলার নিকট যাওয়ার প্রস্তুতি গ্রহণ করছি। হাজী সাহেব তাকেও সাথে নিয়ে গন্তব্যে পৌঁছে গেলেন।

মহিলা সেই রোগাক্রান্ত লোকদেরকে দেখে চেনে ফেললো এবং বললো, যদি তোমরা নিজ নিজ অপরাধের কথা আমার সামনে স্বীকার কর তবে তোমাদের রোগ মুক্তির জন্য দোয়া করবো, নতুবা দোওয়া করবো না। মহিলার এ প্রস্তাবে তারা অসম্মতি জানায়। কিন্তু মহিলাও দৃঢ়ভাবে জানিয়ে দেয় যে যতক্ষণ তারা অপরাধ স্বীকার না করবে, ততক্ষণ দোয়াও করা হবে না। কাজেই তারা নিরুপায় হয়ে জনৈক মহিলার সাথে কৃত অপরাধের কথা স্বীকার করল। এদিকে মহিলা তার স্বামী হাজী সাহেবকেও দেখামাত্রই চিনতে পারলো। সুতরাং সে পর্দার আড়াল থেকে বের হয়ে তার স্বামীর সাথে সাক্ষাত করলো, এবং তার উপর দিয়ে বয়ে যাওয়া সকল লোহমর্ষক ঘটনাগুলো একের পর এক বর্ণনা করল। সাথে সাথে একথাও জানিয়ে দিল যে, ঐ রোগক্রান্ত লোকেরাই তার শ্লীতাহানীর অপচেষ্টা করেছিল। যাহোক মহিলা লোকদেরকে বললো, তোমরা প্রত্যেকেই নিজ নিজ কৃত অপরাধের জন্য তাওবা কর এবং আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাও। আল্লাহ তোমাদের হয়তো ক্ষমা করে দিবেন। আর আমার পক্ষ থেকে তোমাদেরকে মাফ করে দিলাম। এ কথা বলে মহিলা তাদের জন্য দোয়া করলেন। তারা রোগ থেকে মুক্তি পেল এবং অত্যন্ত লজ্জিত হয়ে মহিলার নিকট ক্ষমা চাইলো। মহিলাও তাদের ক্ষমা করে দিলেন।

হযরত খাদিজা রাযি. এর সফল পরীক্ষা

রাসূল সা.ও খাদিজা রাযি. ঘরে বসে কথা বলছিলেন। এমন সময় দরজার কাছে এসে উপস্থিত হলেন জিবরাইল আ.। তিনি নবীজীকে সালাম দিলেন। রাসূল সা. যথারীতি তার উত্তর দিলেন। খাদিজা রা. অবাক হয়ে বললেন, আপনি কাকে সালাম দিলেন? রাসূল সা. বললেন, কেন? ওই যে জিবরাইল আ. দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি আমাকে সালাম দিয়েছেন আর আমি তার উত্তর দিলাম। খদিজা রা. কাউকে দেখতে না পেয়ে বিস্ময়ের সঙ্গে বললেন, আমি তো কাউকে দেখতে পাচ্ছি না।? মহানবী সা. বললেন, আমি দেখতে পাচ্ছি। এবার খাদিজা ব্যপারটা পরখ করে দেখতে চাইলেন।

নিজের মাথার ওড়না ফেলে দিয়ে মাথা ও মুখমন্ডল অনাবৃত করলেন। তারপর রাসূল সা. কে জিজ্ঞেস করলেন এবার কি তাকে দেখতে পাচ্ছেন? রাসূল সা. অবাক হলেন। চোখের পলক পড়তে না পড়তেই অন্তর্হিত হলেন জিবরাঈল আ.। খাদিজা রা. সবিনয়ে বললেন, এখন কি দেখতে পাচ্ছেন? রাসূল সা. বললেন না, জিবরাইল আ. কে এখন দেখতে পাচ্ছি না।

এরপর সবকিছু স্পষ্ট হয়ে উঠল খাদিজার রা.-এর কাছে। তিনি বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ সা., এবার আমি নিশ্চিত যে আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যিনি আসেন তিনি আসলেই ফেরেশতা জিবরাইল আ.। রাসূল সা. জিজ্ঞেস করলেন কিভাবে তা বুঝতে পারলেন? খাদিজা রা. বললেন, তাওরাত ও ইঞ্জিল কিতাবে এরকম পরীক্ষার কথা বলা আছে। রাসূল সা. জানতে চাইলেন পরীক্ষাটা কি শোনা যাবে? হ্যাঁ, অবশ্যই শোনা যাবে। আপনার কাছে আগন্তুক একজন ফেরেশতা আসে আমি তা নিশ্চিত হয়েছি এভাবে যে, তিনি ফেরেশতা না হয়ে জীন-পরি বা অন্য কিছু হলে আমার ওড়না অনাবৃত্ত মাথাও মুখ মন্ডল দেখে চলে যেতেন না। হযরত খাদিজার রা. জীবনি থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে, ছবি টানানো কোন ঘরে বা যে ঘরে বেপর্দা নারী থাকে সেখানে রহমতের ফেরেশতা প্রবেশ করে না।

প্রিয় পাঠক! এখন চিন্তা করে দেখুন আমাদের হাট-বাজারে, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে যেভাবে মা-বোনেরা খোলা মাথায় বা বেপর্দায় চলছে, শয়তান ছাড়া রহমতের ফেরেশতা তাদের সঙ্গে থাকতে পারে কি? এ বিষয়ে পবিত্র কোরআনের সূরা নূর ও আহজাবের অর্থ পড়ুন।

মুর্খের শিক্ষা

একদিন একটি কাক এক টুকরা গোশত চুরি করে নিয়ে একটি গাছের ডালে এসে বসল। সেই সময় গাছের নিচ দিয়ে এক ধূর্ত শিয়াল যাচ্ছিল। কাকের মুখে গোশতের টুকরো দেখে শিয়ালের খুব লোভ হলো। শিয়াল মনে মনে স্থির করল যেমন করেই হোক কাকের কাছ থেকে গোশতের টুকরাটি নিতেই হবে। কথায় পটু ধূর্ত শিয়াল তখন কাকের বিভিন্ন কাজের তা'রিফ করতে লাগল। সত্যি ভাইয়া, তুমি দেখতে কি সুন্দর, কি বিশাল তোমার দেহ, কাল কুচকুচে গায়ের রং আর চোখ দুটি আহা যেন দুটো মুক্তোর দানা। আমার তো মনে হয় তোমার প্রতি বেশ অন্যায় করা হয়েছে। পাখিদের রাজা তোমাকেই করা দরকার ছিল। আর ভাই, গলার স্বরটি যদি তোমার দেহের মতোই সুন্দর হয় তবে আমি কথা দিলাম আমি তোমাকে পাখিদের রাজা বানাবো।

শিয়ালের মুখে নিজের এত প্রশংসা শুনে গলার স্বরটি তাকে শোনানোর জন্য কাক অস্থীর হয়ে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে কা, কা করে ডেকে উঠল। ডাকতে গিয়ে ঠোঁট ফাঁক করতেই কাকের মুখ থেকে গোশতের টুকরাটি মাটিতে পড়ে গেল। গোশতের টুকরাটি মাটিতে পড়তেই শিয়াল সাথে সাথে সেটাকে মুখে নিয়ে পালাতে পালাতে চেচিয়ে সে কাককে বলল, বন্ধু, যদি তোমার অন্য গুণগুলোর সঙ্গে মগজে কিঞ্চিৎ পরিমাণ বুদ্ধি থাকতো তবে তুমি ঠিকই আমাদের রাজা হতে পারতে।

যে যায় সে আসে না

যৌবন যার যুদ্ধ তার। এক বৃদ্ধ সিংহ বেশ দুর্বল হয়ে পড়ল। শক্তির অভাবে খাদ্য সংগ্রহ করা যখন কিছুতেই সম্ভব হচ্ছে না,তখন সিংহ মনে মনে স্থির করল যে, বুদ্ধির জোরেই সে তার খাদ্য জোগাড় করবে। গুহায় শোয়ে সে পুরো বনে প্রচার করল যে, সে অত্যন্ত অসুস্থ্য। বনের পশুদের উচিত তাদের অসুস্থ্য রাজাকে দেখতে আসা এবং তার মনোরঞ্জন করা ও সেবা-যত্নের ব্যবস্থা করা। রাজার অসুস্থ্যতার কথা শুনে পশুরা রাজাকে দেখতে গুহার মধ্যে আসতে শুরু করলো। রাজা এই সুযোগ হাতছাড়া

করতে চাইল না। সুযোগ বুঝে রাজা তাদের মেরে নিজের খাবারের ব্যবস্থা পাকা করল।

এভাবে অনেক পশু নিহত হওয়ার পর বন যখন শূন্য হতে চলছে তখন এক ধূর্ত শেয়াল রাজার চালাকী বুঝতে পারল। সিংহকে হাতেনাতে ধরার জন্য শিয়াল গুহার মুখে দাঁড়িয়ে পশু রাজাকে জিজ্ঞেস করল, মহারাজ! আপনার শরীর এর অবস্থা কেমন? সিংহ শুয়েই উত্তর দিল, অত্যন্ত দুর্বল। শোয়া থেকে উঠতে পারি না। খাবারেও কোন রুচি নেই। তো বাছা এত দূরে দাঁড়িয়ে আছো কেন? কাছে এসো। কিছু সুখ-দু:খের কথা বলি।

শিয়াল হেসে বলল, রাজা আপনার কাছে যাবার সম্পূর্ণ ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও আপনার এই হতভাগ্য প্রজা কাছে যাবার সাহস পাচ্ছে না। কারণ পশুদের শুধু ভিতরে যাবার ছাপগুলো দেখছি কিন্তু বাইরে বেরিয়ে আসার ছাপ একটিও নজরে পড়ছে না। অতএব, মহারাজ! আমি বুঝতে পেরেছি; যে যায় সে আসে না। আমি দূরে থেকেই আপনার কুশল জানতে আগ্রহী।

প্রিয় পাঠক, শিয়াল তার মেধা খাটিয়ে কিভাবে আত্মরক্ষা করলো। মিষ্টি কথার ফাঁদে পড়লো না। কিন্তু আজ অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, মুসলমান ইহুদীও নাছারার মিষ্টি কথার ফাঁদে পড়ে ঈমান-আমল সব খোয়াচ্ছে তারপরও তাদের বোধোয় হচ্ছে না।

তাই আসুন আজই এ সিদ্ধান্ত নেই আমরা ইয়াহুদীও নাসারাকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করবো না। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ

অর্থাৎ হে ঈমানদারগণ! তোমরা ইয়াহুদীও নাসারাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করবো না।

১৩শ বছর পর দুইজন সম্মানিত সাহাবী রা.-এর লাশ অক্ষত অবস্থায় স্থানান্তর

খুব বেশী দিন আগের কথা নয় ১৩৫০ হিজরীর ১৯জিলহজ্জ মোতাবেক ১৯৩২ সালের ঘটনা। আধুনিক যুগে এ বিস্ময়কর ঘটনা ইসলামের একটি মোযেঝা। পূণ্যভূমি ইরাকের বাগাদাদ শহর থেকে ৪০ মাইল দূরে'সালমান'

পার্ক নামক মাদায়েন এলাকায় এ ঘটনাটি প্রকাশ পায়। যার সচিত্র দৃশ্য সরাসরি প্রত্যক্ষ করে অসংখ্য ইহুদী ও খৃষ্টান পরিবার স্বেচ্ছায় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে।

ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ হল এই, তখন ইরাকে বাদশাহ ছিলেন ফয়সাল। বাদশাহ ফয়সালকে হযরত হোযায়ফা রা. স্বপ্নে বলেন, হে বাদশা, আমি হযরত হুযাইফা রা.। আমার কবরে পানি প্রবেশ করছে আর হযরত জাবের রা. এর কবরে আদ্রতা দেখা দিয়েছে। অতএব, আমাদের কবরদ্বয়কে স্থানান্তর করে দজলা নদীর সামান্য দূরে দাফন করা হোক। বাদশাহ পরপর দুই রাত এ স্বপ্ন দেখলেন। তৃতীয় রাতে ইরাকের তৎকালীন মুফতীয়ে আজমকে হযরত হোযায়ফা রা. স্বপ্নে একটি নির্দেশ প্রদান করে বলেন, আমরা গত দুই রাত যাবৎ বাদশাহকে বলেছি কিন্তু তিনি এ ব্যাপারে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি। এখন আপনাকে বলছি, বাদশাহকে বিষয়টির প্রতি মনোযোগী করে দ্রুত ব্যবস্থা করুন।

পরের দিন ভোরে ইরাকের তৎকালীন মুফতীয়ে আজম, প্রধানমন্ত্রী নূরী আস সাঈদকে সঙ্গে করে বাদশাহর সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং মুফতীয়ে আজম বাদশাহকে তার স্বপ্ন খুলে বলেন। বাদশাহ ফয়সাল বলেন, আমিও দুই রাত এই একই স্বপ্ন দেখেছি। আপনি কবরদ্বয় খোড়ার ফতোয়া দিলে আমি তা বাস্তবায়ন করতে প্রস্তুত আছি। ইরাকের মুফতিয়ে আজম কবরদ্বয় খোলার ও লাশ স্থানান্তর করার ফতোয়া প্রদান করেন। তখন এ ফতোয়াও বাদশাহর শাহী ফরমান ইরাকের পত্রিকাগুলোতে প্রচার করা হয়।

বাদশাহ সিদ্ধান্ত নিলেন যে, কুরবানীর ঈদের দিন যোহরের নামাজের পর উল্লেখিত সাহবাদ্বয়ের কবর স্থানান্তর করা হবে। ইরাকী পত্র-পত্রিকায় ঘোষণাটি প্রচারিত হওয়ার সাথে সাথে সমগ্র মুসলিম বিশ্বে এ খবর বিদ্যুতের মত ছড়িয়ে পড়ে। রয়টার ও অন্যান্য সংবাদ মাধ্যম এ খবর সারা বিশ্বে পৌঁছে দেয়।

এদিকে বিশ্বের হাজার হাজার মুসলমান পবিত্র হজ্জ উপলক্ষে মক্কায় সমবেত হচ্ছিলেন। হজ্জে গমণকারীরা এ খবর জানার পর ইরাকের বাদশাহের নিকট আবেদন করল যে, সাহাবীদ্বয়ের কবর হজ্জ অনুষ্ঠিত

হওয়ার কয়েকদিন পরে খোলা হোক। যাতে হজ্জ সম্পাদন করে বিভিন্ন দেশের মুসলমাগণ এতে অংশগ্রহণ করতে পারেন।

এভাবে হিজাজ, মিসর, সিরিয়া, লেবানন, ফিলিস্তিন, ইরান, বুলগেরিয়া,আফ্রিকা হিন্দুস্থান এবং অন্যান্য বহু দেশ থেকে অসংখ্য বার্তা পাঠানো হল যে, আমরাও এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে আগ্রহী। অনুগ্রহ করে নির্ধারিত তারিখ কয়েকদিনের জন্য পিছিয়ে দেয়া হোক। মুসলামানদের আগ্রহের প্রেক্ষিতে এই মর্মে দ্বিতীয় ফরমান জারী করা হল। হজ্জ সমাপনের দশ দিন পরে এই অনুষ্ঠান হবে। সেই সাথেই দ্রুত সর্তকতামূলক ব্যবস্থাও গ্রহণ করা হয় যাতে কবর পর্যন্ত পানি পৌঁছতে না পারে। যেমনটি স্বপ্নে দেখানো হয়েছিল।

হজ্জ অনুষ্ঠিত হওয়ার দশ দিন পর অর্থাৎ ১৯ জিলহজ্জ সোমবার দুপুর ১টায় লাখ লাখ মানুষের উপস্থিতিতে সাহাবীদ্বয়ের কবর দুটি খোলা হয়। কি আশ্চর্য ব্যাপার হযরত হোযায়ফা রা. এর কবরে পানি প্রবেশ করেছিল এবং জাবের রা. এর কবরেও আদ্রতা দেখা দিয়েছিলো, অথচ দাজলা নদী সেখান থেকে প্রায় দুই মাইল দূরে অবস্থিত। বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূত এবং ইরাক সরকারের সকল সদস্য ও বাদশাহ ফয়সালের উপস্থিতিতে প্রথমে হযরত হোযায়ফা রা. এর লাশ ক্রেণের মাধ্যমে ভূমি হতে এমনভাবে উঠানো হয় যে, লাশ ক্রেণের সাথে রাখা স্ট্রেচারে নিজে নিজে উঠে যায়।

অত:পর ক্রেণ হতে ষ্ট্রেচারে আলাদা করেন বাদশাহ ফয়সাল, ইরাকের মুফতীয়ে আজম এবং তুরস্কের মন্ত্রী। মিশরের বাদশাহ ফারুকের পুত্র যুবরাজ তা কাঁধে বহন করেন। অত:পর সেটা অত্যন্ত মর্যাদার সাথে কাচেঁর বাক্সের ভিতরে রাখা হয়।

অত:পর হযরত জাবের রা. লাশ মোবারক কবরের বাইরে আনা হয়। আশ্চর্য ব্যাপার হলো উভয়ে লাশের কাফন, দাঁড়ি এবং কেশ মোবারক এমনভাবে অক্ষত ছিল যে, মনে হচ্ছিল লাশ দাফনের ২/৩ ঘন্টাও অতিবাহিত হয়নি। অথচ ১৩শত বছর আগের লাশ। আরো বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, এ দুজন সাহাবীর চোখ কলো ছিল। চোখগুলোতে এত তীক্ষ্ম জ্যোতি ছিল যে, বহু লোকের ইচ্ছা ছিল তাদের চোখের সাথে তারা

চোখ মিলিয়ে দেখবে। কিন্তু তাদের দৃষ্টি সেই পবিত্র চোখগুলোর নূরানী জ্যোতির কাছে স্থির থাকতে পারেনি। অভিজ্ঞ ডাক্তাররা এ অবস্থা দেখে হতবাক হয়ে যান।

একজন আর্ন্তজাতিক খ্যাতি সম্পন্ন চোখ বিশেষজ্ঞ জার্মান ডাক্তার এটা দেখে মুফতিয়ে আজমের হাত ধরে বলেন, আপনাদের ইসলাম ধর্মে সাহাবায়ে কিরামের মহাত্মের এর চেয়ে বড় প্রমাণ আর কি হতে পারে? এই বলে তিনি কালেমা পাঠ করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। এ প্রসেঙ্গ উল্লেখ্য যে, মহানবী সা. এর দুই সম্মানিত সাহাবীর লাশ তেরশ বছর পর স্থানান্তরের সে ঘটনা দুনিয়ার সকল বড় বড় সংবাদপত্রে বড় শিরোনামে প্রচার করা হয়।

উল্লেখ্য যে, হযরত হোযায়ফা রা. ছিলেন বহু হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবী, শাসক,অনেক দেশ বিজেতাও সেনাপতি। হযরত ওমর র. তাকে মাদায়েনের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেছিলেন। ৩৬ হিজরিতে তিনি মাদায়েনে ইন্তেকাল করেন। হযরত জাবের রা.ও বহু হাদীস বর্ণনাকারী প্রসিদ্ধ সাহাবী ছিলেন। কোন কোন লেখকের বর্ণনা উক্ত দ্বিতীয় সাহাবী হযরত জুবায়ের রা. বলে ধারণা করা হয়। কেননা বলা হয় হযরত জাবের রা. এর মাজার মদিনায়। মোটকথা দু'জন মহান সাহাবীর লাশ ১৩শ বছর পর অক্ষত অবস্থায় স্থানান্তর করা হয়। (দৈনিক ইনকিলাব পত্রিকা থেকে সংগৃহিত)

মরণের ভয়

অনেক অনেক দিন আগের কথা। ধু-ধু মরুময় আরব দেশের একদিকে লোহিত সাগর আর আরেকদিকে আরব সাগর। লোহিত সাগরের উপকূলবর্তী একগ্রামে এক জেলে বাস করত। জেলের নাম ছিল হিতান। সে খুব সাহসী ও শক্তিশালী ছিল। অনেক সময় তার জালে খুব বড় বড় মাছ ধরা পড়ত। সে মাছ আকারে প্রায় তিমি মাছের মত। তাই তার এলাকার লোকেরা তাকে নাম দিয়েছিল হিতান। (অর্থাৎ তিমি মাছ)

একদিন হিতান মাছ ধরার জন্য বাড়ি থেকে বের হয়ে সমুদ্রের দিকে যাচ্ছিল। এমন সময় পথে সে এলাকার শাসক হিব্বানের সঙ্গে দেখা।

হিব্বান ইশারায় হিতানকে কাছে ডেকে জিজ্ঞাসা করল, বাবা, তোমার নাম কি? বাড়ী কোথায়? কি কাজ কর? কোথায় যাচ্ছ? হিতান সালাম দিয়ে বিনয়ের সঙ্গে বললো, হুজুর, আমাকে লোকে হিতান বলে ডাকে। আমার বাড়ি ওই দূরে হিরন গ্রামে।

এই বলে সে আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করে তার গ্রামের দিকে দেখিয়ে দিল। তারপর বলল, আমি মাছ ধরি এবং তা বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করি। এখন আমি মাছ ধরতে সমুদ্রের দিকে যাচ্ছি। হিব্বান জিজ্ঞাসা করলেন, আচ্ছা তুমি যে সমুদ্রে মাছ ধর, সমুদ্রে তো অনেক সময় ঝড় উঠে, তুফান হয়, বড় বড় পাহাড়ের মত কত ঢেউ উঁচু হয়ে আসে; অনেক সময় নৌকা ডুবেও যায় তাতে তোমার ভয় লাগে না? হিতান বলল, হ্যাঁ! হুজুর ভয়তো লাগে। সমুদ্রে মাছ ধরা অনেক ঝুকিপূর্ণ কাজ। অনেক সময় জীবন বিপন্ন হয়ে পড়ে। হুজুর, আমরা গরীব মানুষ দিন আনি দিন খাই। মৃতুর ভয়ে বাড়ি বসে থাকলে তো কেউ খেতে দিবে না। তাই বিপদের আশংকা জেনেও সমুদ্রে যেতে হয়।

তারপর হিব্বান তাকে বলল, তোমার পিতা কি করত? হিতান বলল, আমার আব্বাও মৎস্যজীবি ছিলেন। তিনিও সমুদ্রে মাছ ধরতেন। আমি ছোট বেলা থেকে তার সঙ্গে মাছ ধরতে যেতাম। তিনি বেঁছে নেই। দু'বছর আগে সমুদ্রে যে ঘুর্ণিঝড় হয়েছিল সে সময় তিনি নৌকা ডুবে মারা যান।

হিব্বান আবার জিজ্ঞাসা করল আচ্ছা তোমার দাদা কি করত? হিতান জবাব দেন হুজুর, তিনিও মাছ ধরতেন।

হিব্বান বলল, তোমার দাদা কিভাবে মারা গেল? হিতান বলল, হুজুর তিনিও সমুদ্রের ঝড়ে মারা গিয়েছে। কি! এরপরও তোমার ভয় লাগে না? তুমি সেই সমুদ্রেই মাছ ধরতে যাও।

ইতোমধ্যেই জড়তা অনেকখানি কেটে গেছে। সে সোজা হয়ে নি:সংকোচে বিনীতভাবে বলল, হুজুর, আপনি তো আমাদের এলাকার শাসক? হিব্বান বললেন, হ্যাঁ, তাতে কি হয়েছে? না হুজুর, কিছুই হয়নি। যদি বেয়াদবী মনে না করেন তাহলে একটি কথা জিজ্ঞেস করব। হুজুর, আপনি তো দালানের সুন্দর কামরায় আরামদায়ক বিছানায় আরামে থাকেন

তাই না? হিব্বান বললেন, হ্যাঁ! তারপর হিতান জিজ্ঞাসা করে হুজুর, আপনার পিতা কোথায় থাকতেন? হিব্বান বললেন, এই বাড়ীতেই থাকতেন। তিনি কোথায় মারা যান? হিব্বান বলল, কেন? তিনি এ ঘরেই পালঙ্কের উপরেই অসুস্থ্য অবস্থায় মারা যান। হিতান আবার জিজ্ঞেস করল, হুজুর আপনার দাদা কোথায় ছিলেন? তিনি কোথায় কিভাবে মারা যান? হিব্বান জবাব দেয় তিনিও এ বাড়িতে থাকতেন এবং বৃদ্ধ বয়সে এ বাড়িতেই (এখন আমি যে, ঘরে থাকি) সেখানেই তিনি মারা যান। হিতান এবার বিনয়ের সঙ্গে বললো, হুজুর, আপনার দাদা এ ঘরে এ বিছানায় শুয়েই মারা গেছেন। আপনার পিতাও এ ঘরে এ বিছানায় শুয়েই মারা গেছেন। তো এ ঘরে এ বিছানায় শুইতে আপনার ভয় করে না? হিব্বান জবাব দেন। কেন ভয় করবে? হিতান বিনয়ের সুরে বলেন, হুজুর, এই ঘরে আপনার দাদা ও আপনার পিতা উভয়ে মারা গেছে। আর আপনি এ বিছানায় শুইতে ভয় পান না। আপনার মৃত্যুর ভয় নেই? হিব্বান বললেন, ভয়ের কি আছে? মরণ এলে মরে যায়।

হিতান তখন ধীরে ধীরে বলেন, হুজুর, গোস্তাখী মাফ করবেন, আপনার দাদা ও বাবা মারা যাওয়ার পরও যেমন আপনার ঘর ও শয্যাকে আপনিও ভয় করেন না, আমি তেমনি সমুদ্রের ঝড় ও ঢেউকে ভয় করি না। আমার দাদা ও বাবা মারা গেছেন জেনেও আমি সেই বিশাল সুমদ্রে মাছ ধরতে যাই। মুত্যু এলে মরে যাব। ভয়ের কি আছে? আপনার কাছে আপনার শাহী বালাখানা এবং আরামাদায়ক শাহী শয্যা যেমন, আমার কাছে ঝড়ো সুমদ্রের উত্তাল তরঙ্গও তেমন।

নাসির গাজীর ঝুলি

একবার নাসির গাজীর পার্শ্ববর্তী গ্রামে এক ভন্ড লোক নিজেকে পীর বলে দাবী করল। সে ভন্ডামী করে মানুষের ধন-সম্পদ ও টাকা-পয়সা হাতিয়ে নিতে লাগল এবং কয়েকজন অনুসারীও জোগাড় করে নিল। এলাকার ভাল লোকেরা নাসির গাজীর কাছে এসে সেই ভন্ডপীরের ভন্ডামী থেকে কিভাবে রেহাই পেতে পারে পরামর্শ চাইল।

নাসির গাজী একদিন সে ভণ্ডপীরের গ্রামে গেল তার কর্মকাণ্ড প্রত্যক্ষ করতে। নাসির গাজী তার কামরায় প্রবেশ করা মাত্রই দেখতে পেল সে চোখ বন্ধ করে হাত নেড়ে বলছে চেই! চেই! চেই! দূর হ, দূর হ। তার অনুসারীরা জিজ্ঞেস করল, কি তাড়াচ্ছেন বাবাজী? তখন ভন্ডপীর বলল, একটি কুকুর হেরেম শরীফের ভিতরে যাচ্ছিল, আমি কুকুরটাকে তাড়ালাম।

নাসির গাজী বুঝতে পারলেন লোকটি চরম ভন্ড ও চালাক। তাকে তার ভন্ডামির সমুচিত শিক্ষা দিতে হবে। নাসির গাজী ধীরে ধীরে তার নিকটে গেলেন এবং তাকে ও তার অনুসারীদেরকে উদ্দেশ্য করে বললেন, আগামী শুক্রবার দুপুরে আমার বাড়িতে আপনাদের দাওয়াত। দিন ঘুরে শুক্রবার এল। জুমআর নামায পড়ে নাসির গাজী তার আমন্ত্রিত অতিথিদের খাবার পরিবেশন করতে লাগলেন। সবাইকে তরকারী দিলেন ভাতের উপরে, শুধু ভন্ডপীরের তরকারী দিলেন ভাতের নীচে।

সকলে খেতে শুরু করল, আর ভন্ডপীর এ দিকে ওদিকে তাকাতে লাগল। সে মনে মনে ভাবতে লাগল হায়! আমার তরকারী কোথায়?

নাসীর গাজীর বাড়িতে ভোজসভায় নিমন্ত্রিত অতিথি ব্যতীত শত শত উৎসুক জনসাধারণ দেখতে এল কিভাবে নাসির গাজী ভন্ডপীরের ভন্ডামী থেকে মানুষকে রেহাই দেন।

এদিকে ভন্ডপীর তরকারী না দেখতে পেয়ে নিজে বড়ই অপমান বোধ করছে। হঠাৎ সে মুখ ফুটে বলেই ফেলল, আমার তরকারী কোথায়? তখন নাসির গাজী উপস্থিত লোকদেরকে উদ্দেশ্য করে বলল, দেখলেন তো ভাইয়েরা! আপনাদের পীর সাহেব ঘরে বসে মক্কা শরীফের কুকুর তাড়াতে পারে অথচ ভাতের নীচের তরকারীর কথা বলতে পারে না? তিনি আসলে সত্যিকারে পীর নন, তিনি একজন ভন্ড। তখন ভন্ডপীরের অনুসারীরা তার ভন্ডামী বুঝতে পারল এবং গ্রামবাসীসহ সকলে মিলে ভন্ডপীরকে ভালোভাবে গণধোলাই দিয়ে বিচার বিভাগের হাতে তুলে দিল। অত:পর সকলেই নাসির গাজীর বুদ্ধির প্রশংসা করতে করতে নিজ নিজ বাড়ির দিকে ফিরে গেল।

অহংকারের পরিণতি

একবার একব্যক্তি তার বিবির কাছে বসে খানা খাচ্ছিল। এমন সময় এক ভিক্ষুক তার দরজায় এসে কিছু চাইলো। লোকটি ভিক্ষুককে সজোরে ধমক দিয়ে তাড়িয়ে দিল। পরবর্তীতে হঠাৎ লোকটি সহায় সম্পত্তি সব হারিয়ে নিঃস্ব হয়ে পড়ে। এমন কি বিবির ভরণ পোষণের খরচ পর্যন্ত দিতে অক্ষম হয়ে পড়ল। যার কারণে বিবিকেও তালাক দিয়ে দিলো। এবং বিবি অন্য একজন সম্পদশালী ধনাঢ্য ব্যক্তির কাছে বিবাহ বসে গেল।

তারপর সহায় সম্পদহীন লোকটি একদিন এক ধনাঢ্য ব্যক্তির বাড়ির দরজায় গিয়ে ভিক্ষা চাইলো। লোকটি বিবিকে বললো, যাও, তাকে ভিক্ষা দিয়ে এসো। বিবি যখন ভিক্ষা দেওয়ার জন্য দরজার সামনে গেল তখন ভিক্ষুকের চেহারা দেখে কাঁদতে কাঁদতে ভিতরে ফিরে এলো। স্বামী তাকে কান্নার কারণ জিজ্ঞাসা করলে সে বলল, আজ যিনি ভিক্ষা করতে এসেছেন তিনি আমার প্রথম স্বামী। তারপর সে তার দ্বিতীয় স্বামীকে প্রথম স্বামী এক ভিক্ষুককে তাড়িয়ে দেওয়ার ঘটনাটি খুলে বললো। তখন দ্বিতীয় স্বামী বললো, যে ভিক্ষুককে সে ধমক দিয়ে তাড়িয়ে দিয়েছিলো সে ভিক্ষুক আমি নিজেই ছিলাম। আল্লাহ আমাকে ধন- দৌলত দান করেছেন এবং তার বিবিও আমাকে দিয়ে দিয়েছেন।

(সুত্র : হযরত থানভী রহ.-এর মাওয়ায়েয আল ইবকা এর ২২নং পৃষ্ঠা)

প্রিয় পাঠক, ইহাই হলো গরীবকে ঘৃণা করার পরিণতি। আজ বিশ্বের মানচিত্রের দিকে তাকালে দেখা যায় ধনীরা দিন দিন ফুলে কলা গাছ হচ্ছে আর গরীবরা দিন দিন নিঃস্ব হচ্ছে। কেউ থাকে দশ তলায় আর কেউ থাকে গাছতলায়। আজ গরীবদেরকে সাহায্য-সহযোগিতা করাতো দূরের কথা বরং তাদের খোঁজ খবর নেওয়াকেও অসম্মান মনে করা হয়। অথচ রাসূল সা. দোয়ায় বলেছেন,

اللهم اجعلنى مسكينا وامتنى مسكينا واحشرنى فى زمرة المساكين

অর্থাৎ আয় আল্লাহ! আমাকে মিসকিন হিসাবে জীবিত রেখ, মিসকিন হিসাবে মৃত্যু দিও এবং মিসকিনদের দলভুক্ত করে হাশরের ময়দানে উঠাইও।

তাই আসুন, গরীবদেরকে সহযোগিতা করে ঈমানী দায়িত্ব পালন করি। তাহলে ধনী-গরীবের মাঝে সম্পর্কের ভীত মজবুত হবে এবং সমাজ হবে ভারসম্যময়ও সুন্দর; দূর হবে মারামারী,কাটাকাটি, হিংসা-বিদ্বেষ-অহংকার। আল্লাহ আমাদের সবাইকে গরীবদের সাহায্য করার তৌফিক দান করুন। (আমীন)

একেই বলে লজ্জা

ঘটনাটি ইমদাদুল্লাহ মোহাজেরে মক্কি রাহ. এর। হযরতের খাদেম বলেন, আমি হযরতকে দেখতাম শোয়ার সময় পা গুটিয়ে শোতেন। প্রথম প্রথম আমি মনে করতাম যে, হয়তো ওজরের কারণে হযরত পা গুটিয়ে শয়ন করেন। পরে দেখতে পেলাম যে, ইহা হযরতের ওজর নয় বরং অভ্যাস। তখন আমি হযরতকে পা গুটিয়ে শয়ন করার কারণ জিজ্ঞাসা করলাম। হযরত বললেন, মালিকের সামনে গোলাম কি পা ছড়িয়ে শয়ন করতে পারে? অদৃশ্যমান আল্লাহর সামনে পা ছড়িয়ে শয়ন করতে আমার খুব লজ্জা হয়। তাই আমি পা গুটিয়ে শয়ন করি। ইহাই ছিলো আল্লাহ ওয়ালাদের খোদাভীতি। তাঁরা যে কত সুক্ষ্ম ও দূরদৃষ্টি সম্পন্ন ছিল তা ভাষায় প্রকাশ করা দুরূহ।

(সূত্রঃ থানবীর মাওয়ায়েজ আল ইবকা এর ওয়াজুল ইত্তেয়াজ
বিল গায়ের নামক অধ্যায়ের -২২নং পৃষ্ঠা)

তাঁরা যেসব বিষয়ে তিক্ষ্ম চিন্তা করতেন এবং আল্লাহ্ তায়ালার ভালবাসা তাদের অন্তরে কত বদ্ধমূল ছিল তা ভাবতেই অবাক লাগে। আর আমাদের বর্তমান প্রজন্মের অবস্থা হলো সম্পূর্ণ বিপরীত। ছোট ছোট বিষয় না হয় বাদই দিলাম কিন্তু ফরজ ও ওয়াজিবের অবস্থা এমন যে, মনে হয় তা ছাড়ার জন্য রীতিমত প্রতিযোগিতা চলছে। তারপরেও আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে বাঁচিয়ে রেখেছেন তা আল্লাহর মেহেরবানী ছাড়া আর কিছু নয়।

কাবা ঘরের গিলাফের সম্মানে

হযরতের আরো একটি ঘটনা। হযরতের খাদেম বলেন, একবার এক মুরিদ হযরতকে একজোড়া কালো জুতা হাদিয়া দিলো। কিন্তু অনেক দিন হয়ে গেল হযরত জুতা জোড়া ব্যবহার করেন না। তাই আমি একদিন হযরতকে জিজ্ঞাসা করলাম হযরত, মানুষ তো আপনার জন্য খুশি হয়ে হাদিয়া পাঠায় যাতে আপনি সেগুলো ব্যবহার করেন অথচ আপনি জুতাগুলো ব্যবহার করেন না এর কারণ কি? তখন হযরত বললেন, যে, ইহার রং কালো। আর যখন থেকে আমার কাছে কাবা শরীফের গিলাফ কালো মনে হয়েছে তখন থেকে আমি কালো জুতা ব্যবহার করি না। কেননা ইহা আমার কাছে আদবের খেলাফ মনে হয়। আদবের প্রতি তাঁরা কত সর্তক ছিলেন।

(সূত্র : আল ইবকা এর খাওয়াচ্ছুল খাশয়াহ নামক অধ্যায়ের ১৩নং পৃষ্ঠা।)

ইব্রাহীম আ.-এর মেহমান

তাফসীরে কুরতুবীতে ঈসরাঈলী সূত্র উদ্ধৃত করে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত ইব্রাহিম আ. একদিন তাঁর সাথে খানা খাওয়ার জন্য মেহমান তালাশ করছিলেন। এমন সময় অচেনা এক লোকের সাথে তার সাক্ষাৎ হল। তিনি তাকে ঘরে নিয়ে এলেন। যখন খানা খেতে শুরু করবেন, তখন ইব্রাহিম আ. আগন্তুক-মুসাফিরকে বললেন, বিসমিল্লাহি (আল্লাহর নামে আরম্ভ করছি) বল। সে বলল, আল্লাহ কাকে বলে আমি জানি না। হযরত ইব্রাহীম আ. রাগান্বিত হয়ে তাকে দস্তরখানা থেকে তাড়িয়ে দিলেন। যখন সে বের হয়ে গেল তৎক্ষনাৎ হযরত জিবরাইল আ. অবতরণ করে বললেন, আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, আমি তার কুফরি সম্পর্কে অবগত হওয়া সত্ত্বেও সারা জীবন তাকে পানাহার করাচ্ছি। আর আপনি একে এক বেলা খানা দিতে পারলেন না? এ কথা শোনা মাত্র হযরত ইব্রাহীম আ. ঐ লোকটির তালাশে বের হয়ে গেলেন।

অনেক দূর পর্যন্ত তালাশ করতে করতে অবশেষে তাকে পেয়ে ঘরে নিয়ে এলেন। কিন্তু সে ব্যক্তি বেঁকে বসল এবং বলল, আপনি প্রথমে আমাকে তাড়িয়ে দিলেন, পরে আবার সাধাসাধি করে আনতে গেলেন কেন?

এ কারণ না জানা পর্যন্ত আমি খাদ্য স্পর্শ করব না। হযরত ইব্রাহীম আ. ঘটনাটি বর্ণনা করলেন। কাফের লোকটির মধ্যে ভাবান্তর সৃষ্টি হল। সে বলল, যে মহান পালনকর্তা ফেরেশতা প্রেরণ করে আপনাকে এ কথা জানিয়েছেন, তিনি সত্যিই পরম দয়ালু। আমি তার প্রতি ঈমান আনলাম। অত:পর সে বিসমিল্লাহ বলে হযরত ইব্রাহিম আ. এর সাথে খানা খেতে আরম্ভ করলেন। (সূত্রঃ তাফসীরে মায়ারেফুল কোরআন)

মনে মনে রাগ-মনে মনে ক্ষমা

ঘটনাটি হযরত থানবী রহ. তার মালফুজাতে লিখেছেন। একবার এক কৃষক মাঠের কাজ শেষে বাড়ীতে আসলেন। বাড়ীতে এসে বিবির কাছে খানা চাইলেন। বিবি স্বামীর সামনে খানা হাজির করলেন। ঘটনাক্রমে বিবি সেদিন তরকারীতে লবন দেয় নাই। ফলে বেচারা ভিতরে ভিতরে রেগে ক্ষোভে (অগ্নিশর্মা হয়ে উঠল) দাঁত কড়মড় করতে লাগল এবং বিবিকে মারার জন্য ভিতরে ভিতরে আশপাশে লাঠি তালাশ করতে লাগলো। কিন্তু বেচারী কিছুই বুঝে উঠতে পারছিলো না। তাই স্বামীকে সহজ-সরল মনে বারবার জিজ্ঞাসা করতে লাগলো, আপনি এদিক ওদিক কি তালাশ করছেন, আপনার কি প্রয়োজন? আমাকে বলুন আমি এনে দিব। বেচারা স্বামী মনে মনে কল্পনা করতে লাগলো। হায়রে আমার বিবি! একটি ভুল করেছে তরকারীতে লবন দেয় নাই। তাই আমি রেগে গেছি। আমার তো একটি মেয়ে স্বামীর ঘরে আছে। যদি আমার মেয়েটা এই অপরাধ করতো তাহলে বাবা হিসাবে আমি এটাই আশা করতাম যে, জামাই যেন আমার মেয়েকে মাফ করে দেয়। অতএব, আমার বিবির অপরাধের কারণে আমার শশুর তো আমার কাছে এটাই আশা করে আমি যেন তার মেয়েকে মাফ করে দেই। অতএব আমি আমার বিবিকে মাফ করে দিলাম।

তার এই রাগ করা, কল্পনা করা, এবং ক্ষমা করা এই বিষয়গুলো সে এবং আল্লাহ ছাড়া পৃথিবীর কেউ জানত না। এমনকি স্বামীর মনে যে এতক্ষণ রাগের ঝড় বয়ে গেল এবং আবার তাকে ক্ষমা করে দেয়ার মাধ্যমে রাগ ঠান্ডা হয়ে গেল এ সম্পর্কে বিবি ধারণাই করতে পারলো না।

এভাবে স্বামী খানা শেষ করলো। কিছুদিন পর লোকটি মারা গেলে এক বুযূর্গ তাকে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞাসা করলো তোমার কি অবস্থা? তখন সে বলল, আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। তখন বুযূর্গ জিজ্ঞেস করলেন কিসের উছিলায় ক্ষমা পেলে। তখন সে বলল, আল্লাহ আমাকে ডেকে বলল, একদিন তুমি তোমার বিবির উপর মনে মনে খুব রাগ করেছিলে, তুমি তাকে তোমার রাগ কিছুতেই বুঝতে দাও নাই। এবং মনে মনে তাকে ক্ষমা করে দিয়েছো এ কারণে আমিও তোমাকে গোপনে ক্ষমা করে দিলাম।

প্রিয় পাঠক! অবশেষে আপনাকে একটি দোয়া শিখিয়ে দিতে চাই তাহল

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

যদি কখনো রাগ আসে তখন এই দোয়া পড়লে ইনশাআল্লাহ রাগ কমে যাবে। আল্লাহ আমাদেরকে আমল করার তৌফিক দান করুন। (আমিন)

আমি কেন মুসলমান হলাম?

খলিফা মামুনুর রশিদ এর দরবারের ঘটনা। ইমাম কুরতুবী মুত্তাসিল সনদে খলিফা মামুনুর রশীদের দরবারের একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন। খলিফা মামুনের দরবারে মাঝে মাঝে শিক্ষা সম্পর্কিত বিষয়াদি নিয়ে তর্ক-বির্তক ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হত। এতে জ্ঞান বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার পন্ডিতগণের অংশগ্রহণের অনুমতি ছিল। এমনি এক আলেচনা সভায় জনৈক ইহুদী পণ্ডিত আগমন করল। আকার-আকৃতি পোষাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদি দিক দিয়েও তাকে একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি মনে হচ্ছিল। তদুপরি তার আলোচনাও ছিল অত্যন্ত প্রাঞ্জল, অলংকার পূর্ণ এবং বিজ্ঞজন সূলভ। সভা শেষে মামুন তাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন তুমি কি ইহুদি? সে বলল, হ্যাঁ। মামুন পরীক্ষার্থে তাকে বললেন, তুমি যদি মুসলমান হয়ে যাও, তবে তোমার সাথে চমৎকার ব্যবহার করা হবে। সে বলল, আমি পৈতৃক ধর্ম ত্যাগ করতে পারি না। কথা বার্তা এখানেই শেষ হয়ে গেল।

লোকটি চলে গেল। কিন্তু এক বছর পর সে মুসলমান হয়ে আবার দরবারে আগমন করল এবং আলোচনা সভায় ইসলামী ফেকাহ সম্পর্কে সারগর্ভ বক্তৃতা ও যুক্তিপূর্ণ তথ্যাদি উপস্থান করল।

সভা শেষে মামুন তাকে ডেকে বললেন, আপনি কি ঐ ব্যক্তি যে, গত বছর এসেছিলেন? সে বলল হ্যাঁ! আমি ঐ ব্যক্তিই। মামুন জিজ্ঞেস করলেন, আপনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার কারণ কি? সে বলল, এখান থেকে ফিরে যাওয়ার পর আমি বর্তমান কালের বিভিন্ন ধর্ম সম্পর্কে গবেষণা করার ইচ্ছা করি। আমি একজন হস্তলেখা বিশারদ। স্বহস্তে গ্রন্থাদি লিখে উচ্চ দামে বিক্রয় করি। আমি পরীক্ষার উদ্দেশ্যে তাওরাতে তিনটি কপি লিপিবদ্ধ করলাম। এগুলোতে অনেক জায়গায় নিজের পক্ষ থেকে কমবেশি করে লিখলাম। কপিগুলো নিয়ে আমি ইহুদিদের উপাসনালয়ে উপস্থিত হলাম। ইহুদিরা অত্যন্ত আগ্রহসহকারে কফিগুলো কিনে নিলো। অত:পর এমনিভাবে ইঞ্জিলের তিনটি কপি কম বেশী করে লিখে খ্রিষ্টানদের উপাসনালয়ে নিয়ে গেলাম। সেখনেও খ্রিষ্টানার খুব খাতির যত্ন করে কপিগুলো আমার কাছ থেকে কিনে নিল।

এরপর কোরআনের বেলায়ও আমি তাই করলাম। এরও তিনটি কপি সুন্দরভাবে লিপিবদ্ধ করলাম এবং নিজের পক্ষ থেকে কমবেশী করে দিলাম। এগুলো নিয়ে যখন বিক্রয়ার্থে বের হলাম তখন যেই দেখল, সেই প্রথমে আমার লেখা কপিটি নির্ভূল কিনা যাচাই করে দেখলো। অত:পর বেশ কম দেখে কপিগুলো ফেরত দিল। এ ঘটনা দেখে আমি এ শিক্ষাই গ্রহণ করলাম গ্রন্থটি হুবহু সংরক্ষিত আছে এবং আল্লাহ নিজেই এর সংরক্ষন করেছেন। এরপর আমি মুসলমান হলাম।

এ ঘটনার বর্ণনাকারী কাযী ইয়াহইয়াহ ইবনে আকতাম বলেন, ঘটনাক্রমে সে বছরই আমার হজ্জব্রত পালন করা সৌভাগ্য হয়। সেখানে প্রখ্যাত আলেম সুফিয়ান ইবনে ওয়াইনার সাথে সাক্ষাৎ হলে ঘটনাটি তাঁর কাছে ব্যক্ত করলাম। তিনি বললেন, নি:সন্দেহে এরূপ হওয়াই বিধেয়। কারণ কোরআন পাকে এ সত্যের সমর্থন বিদ্যমান রয়েছে। ইয়াহইয়াহ ইবনে আকতাম জিজ্ঞেস করলেন, এটি কোরআনের কোন আয়াতে আছে? সুফিয়ান বললেন, কোরআনে পাক যেখানে তাওরাতে ইঞ্জিলের আলোচনা করেছে সেখানে বলেছে,

بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِن كِتَابِ اللَّهِ

অর্থাৎ ইহুদি ও খ্রীষ্টানদেরকে আল্লাহর গ্রন্থ তাওরাত ও ইঞ্জিলের হেফাযতের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। এ কারণেই যখন ইহুদী ও খ্রীষ্টানরা হেফাযতের কর্তব্য পালন করেনি, তখন এ গ্রন্থদ্বয় বিকৃত ও পরিবর্তন হয়ে বিনষ্ট হয়ে গেছে। পক্ষান্তরে কোরআন পাক সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

অর্থাৎ আমিই এর সংরক্ষক। আল্লাহ তায়ালা স্বয়ং এর হেফাযত করার কারণে শত্রুরা হাজারো চেষ্টা সত্ত্বেও এর একটি নুক্তা এবং যের ও যবরের পার্থক্য করতে পারেননি। নবী যুগের পর চৌদ্দশ বছর গত হয়ে গেছে। ধর্মীয় ও ইসলামী ব্যাপারে মুসলমানদের ত্রুটি ও অমনোযোগিতা সত্ত্বেও কোরআন পাক মুখস্ত করার ধারা বিশ্বের সর্বত্র অব্যাহত রয়েছে। প্রতি যুগেই লাখো লাখো নয় বরং কোটি কোটি মুসলমান যুবক, বৃদ্ধ এবং বালক ও বালিকা বিদ্যমান রয়েছে যাদের বক্ষ পাঁজরের আগাগোড়া কোরআন সংরক্ষতি রয়েছে। কোন বড় থেকে বড় আলেমের সাধ্য নেই যে, এক অক্ষর ভুল পাঠ করবে। তৎক্ষনাৎ বালক-বৃদ্ধ নির্বিশেষে অনেক লোক তার ভুল ধরে ফেলবে। (সূত্র : তাফসীরে মায়ারিফুল কোরআন, ৭২৬)

দোষ তালাশ করার অদ্ভুত পদ্ধতি

ঘটনাটি একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তির নিকট থেকে শুনেছি। একবার এক লোক কাজ করতে গিয়ে এক মেয়ের প্রেমে আসক্ত হয়ে পড়ে। অথচ লোকটির ঘরে রয়েছে তার সতী-সাধ্বী বিবি। স্বামীর প্রেমের খবর বিবি গুণাক্ষরেও জানতো না। বিবির আগোচরেই তাদের মাঝে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে উঠে। অনেক দিন পর লোকটি মেয়েকে বিবাহের প্রস্তাব দিলে প্রতি উত্তরে মেয়েটি বললো, আমি বিবাহ বসতে পারি এক শর্তে যদি তোমার বিবিকে তালাক দিয়ে দাও।

প্রেমিকার শর্ত শুনে লোকটি বলল, দেখ, আমার স্ত্রী খুব ভদ্র মেয়ে। তার কোন দোষ-ত্রুটি নাই। তালাক দিতে হলে গ্রহণযোগ্য কোন দোষ থাকা চাই। তা তো তার মধ্যে নেই। তাছাড়া তোমাকে বিবাহ করলে আমি আমার স্ত্রীকে বুঝিয়ে রাজী করতে পারবো। ফলে উভয়ে মিলে মিশে থাকতে কোন

সমস্যা হবে না। প্রেমিক যতই বুঝায় কিন্তু প্রেমিকা তার শর্তে অনড়। তাকে তালাক দিতেই হবে। প্রেমিক বললো, দোষ থাকা লাগে না বরং দোষ তৈরী করে নিতে হয়।

যেহেতু প্রেমিকের মাথায় মেয়েটিকে বিবাহ করার ভূত চেপে বসেছে তাই সে স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিল। কিন্তু কিভাবে তালাক দিবে সে তো একজন ভদ্র নারী। তার তো কোন দোষ নাই। এই সব চিন্তা করে সে একটা ফর্মূলা বের করলো যে, স্ত্রীকে প্রতিদিন বিভিন্ন ত্রুটি-বিচ্যুতির উপর ধমকাবে। এভাবে একদিন বিরক্ত হয়ে সে নিজেই আমার সংসার থেকে চলে যাবে। যার ফলে প্রেমিকাকে বিবাহ করার পথ সুগম হবে।

একদিন সে কাজ থেকে ফিরে এসে দেখে খাটের উপর কাপড় চোপড় এলোমেলা হয়ে আছে। তা দেখে সে বিবিকে ইচ্ছামতো বকাঝকা করল। সে বেচারীর উপর ছোট খাটো একটি ঝড় বয়ে গিয়েছিল। এভাবে প্রতিদিন কোন না কোন দোষ বের করতেই লাগলো। আর বেচারীও দিন দিন খুব সতর্কতার সাথে এমনভাবে সংসার গুছিয়ে রাখতো যেন কোন দোষ খুঁজে না পায়।

একদিন স্বামী কাজ থেকে ফিরে এসে দেখে স্ত্রী ঘর খুব সুন্দর করে সাজিয়ে-গুছিয়ে রেখেছে তাতে দোষ ধরার মত বিন্দু মাত্রও সুযোগ নেই। লোকটি বহু চেষ্টা করেও যখন কোন দোষ বের করতে পারলো না, তখন তার দৃষ্টি পড়লো বাড়ির আঙ্গিনার দিকে। আঙ্গিনায় একটি কুকুর শুয়ে ছিল। অনেক চিন্তা করে স্ত্রীকে বিকট এক ধমক দিয়ে বললো, ঐ কুকুরটা, যে বালিশ ছাড়া শুয়ে আছে, বালিশ দিতে পারোনি? দোষ তালাশের এই অদ্ভুত পদ্ধতি দেখে আশে-পাশের লোকজন হাসা হাসি করে বলতে লাগলো দোষ তালাশ করার এই পদ্ধতি জীবনেও দেখি নি।

প্রিয় পাঠক! যখন কেউ মনের বিরুদ্ধে চলে যায় তখন তাকে হেয় করার জন্য নানা অমূলক এবং অগ্রহণযোগ্য দোষ তালাশ করতে থাকে এবং তাকে অপমান করার জন্য আধাজল খেয়ে নামে। মনে হয় যেন তাকে অপমান করতে পারলেই তার জীবন সার্থক। বিশেষ করে জনসাধারণ কর্তৃক পরিচালিত প্রতিষ্ঠানে যারা চাকরী করে তাদেরকে এই সমস্যার মোকাবেলা সবচেয়ে বেশী করতে হয়।

এই সব দুষ্ট লোকদের জন্য রয়েছে কোরআন হাদীসের ঘোষণা অনুযায়ী ভয়াবহ শাস্তি।

পক্ষান্তরে যদি কেউ কারো ইজ্জতের হেফাজত করে তার জন্য রয়েছে পুরস্কারের ঘোষণা।

পাঠক, একটি হাদীস শুনিয়ে ঘটনাটি শেষ করছি। হাদিসটি আবু দরদা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সা. বলেন, যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের সম্মানের উপর আক্রমণকে প্রতিরোধ করবে, আল্লাহ তায়ালা কিয়ামতের দিবসে তার চেহারা থেকে জাহান্নামের আগুন দূর করে দিবেন।

শয়তানের জায়গায় আমার নাম
ফেরআউনের জায়গায় বাপের নাম

প্রিয় পাঠক! শিরোনাম দেখে হয়তো আপনি চমকে উঠছেন। আপনার বিবেক আপনাকে বারবার নাড়া দিচ্ছে ঘটনাটি শুনার জন্য। তাহলে শুনুন! একজনের একটি প্রেস ছিল। লোকেরা তার কাছে বিভিন্ন কিতাবাদি ছাপাতো। কিন্তু মালিকের একটি বদঅভ্যাস ছিল। সে কিতাবাদী ঘেটে ঘেটে বিভিন্ন জায়গাতে নিজের মন মতো পরিবর্তন করতো। যা ছিল খুবই বিরক্তিকর। লোকেরা তাকে এই বদঅভ্যাস থেকে অনেকবার ফিরানোর চেষ্ট করছিল। কিন্তু লোকটা ওয়াদা করেও তার ভঙ্গ করতো। এভাবে অনেক দিন কেটে গেল।

একবার এক লোক তার কাছে কোরআন শরীফ ছাপানোর জন্য আসলো। লোকটি মালিকের বদঅভ্যাস সম্পর্কে আগে থেকে জানতো। তাই সে মালিককে এই বলে হুশিয়ার করে দিলো দেখুন, ইহা কেরাআন শরীফ, আল্লাহর কালাম, তাতে মনগড়া পরিবর্তন করার কোন অনুমতি নেই। করলে কঠিন গোনাহগার হবেন। আপনি তাতে কোন পরিবর্তন করবেন না। মালিকও ওয়াদা করলো আমি তাতে কোন পরিবর্তন করবো না। মালিক লোকটিকে ডেলিভারীর তারিখ জানিয়ে দিল।

যথাসময়ে লোকটি কোরআন শরীফ আনতে গেল। তখন তাকে জিজ্ঞাসা করলো আপনি কি তাতে কোন পরিবর্তন করেছেন? এবার মালিক বিনয়ের

সাথে বললো, দেখুন ভাই আমি পুরা কোরআন পড়েছি। আমার পরিবর্তন করার কোন ইচ্ছাই ছিল না। কিন্তু পড়তে গিয়ে হঠাৎ এক জায়গা দেখি শয়তানের নাম। আরেক জায়গায় দেখি ফেরাউনের নাম। শয়তান আর ফেরাউনের নাম দেখে আমার খুব কষ্ট লাগলো এই ভেবে যে, মহান আল্লাহর কালামে শয়তান এবং ফেরাউনের মতো জালেমের নাম থাকবে কেন? তাই শয়তানের নাম কেটে আমার নাম বসিয়েছি আর ফেরাউনের নাম কেটে আমার বাবার নাম বসিয়েছি।

লোকটির কথা শেষ হতেই উপস্থিত লোকজন হাসতে হাসতে একজন আরেকজনের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়তে লাগল।

প্রিয় পাঠক! ঘটনাটি শুনে হয়তো আপনিও মনে মনে হেসেছেন। কিন্তু শিক্ষার বিষয় হলো ঐ লোকটির মত পৃথিবীতি একদল লোক আগেও ছিল এখানো আছে। যারা কোরআনকে পরিবর্তন করার শ্লোগান তুলেছিল। কিন্তু কেউ সফল হতে পারেনি। আর পারবেই বা কি করে যেহেতু কোরআন আল্লাহ নাযিল করেছেন এবং তিনি তা হেফাজত করার দায়িত্ব নিয়েছেন। তাই তো দেখা যায় পৃথিবীতে বিভিণ্ন সময়ে কোরআনের উপর বিভিন্ন আক্রমণ এসেছে কিন্তু কেরআনকে ধ্বংস করা তো দূরের কথা কোরআনের একটা যের-যবরও পরিবর্তন করতে পারেনি। কিয়ামত পর্যন্ত পারবেও না। ইনশাআল্লাহ। অবশেষে একটি আয়াত দ্বারা শেষ করছি।

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ-

অথাৎ নিশ্চয়ই কুরআন আমিই (আল্লাহ) নাযিল করেছি এবং আমি তার হেফাজতকারী।

আতর নিয়ে বিপাকে

এক লোক বিবাহ করে কয়েকদিন পর সে শশুর বাড়িতে গেলে শাশুড়ী আদর করে জামাইকে একটি আতর হাদিয়া দিল। কিন্তু বেচারা জামাই আতর কিভাবে ব্যবহার করতে হয় তা জানতো না। তাই সে পুরা আতরটা হাতে নিয়ে পায়ের তলায় মাখতে লাগলো। শাশুড়ী এই অবস্থা দেখে রাগে দু:খে চুল ছিড়তে লাগলো আর গদগদ করে বলতে লাগলো, জামাই কত

বেকুব, আতরও চেনে না তেলও চেনে না। ইতোমধ্যে জামাইর বাবা এসে হাজির। এবার শাশুড়ী তার বেয়াইর কাছে বিচার দিয়ে বলল, বেয়াই আপনি কি আপনার ছেলেকে লেখাপড়া করাননি? বেয়াই বললো, লেখাপড়া অবশ্যই করাইছি। কি সমস্যা হয়েছে খুলে বললে ভাল হয়। শাশুড়ী বললো, দেখুন বেয়াই-আপনার ছেলেকে আদর করে একটি দামি আতর হাদীয়া দিলাম। সে পুরাটা আতর পায়ের তলায় মেখেছে।

পাঠক! এবার শুনুন বেয়াই কেমন বিচার করেন। বিয়াইনের কথা শেষ হতে না হতেই বেয়াই বলে উঠলো, বিয়াইন সে একটা গাধা। গাধা না হলে এ কাজ করে? আতর মানুষ খায় আর গাধায় আতর মেখেছে পায়ে। বিয়াইয়ের বিচার দেখে বিয়াইন রাগে দাঁত কড়কড় করতে লাগলো আর মনে মনে বলতে লাগলো, ওতো জামাইর থেকে বড় গাধা।

সকলের প্রিয় বস্তু তিনটি

একবার হুজুর সা. বললেন, দুনিয়াতে তিনটি জিনিস আমার খুব প্রিয়, ১. খুশবু ২. নারী ৩. নামাজ। তখন কয়েকজন সাহাবী রাসূলের সামনে উপস্থিত ছিলেন। তন্মধ্যে হযরত আবু বকর বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ সা., আপনি সত্য বলেছেন, আমার কাছে তিনটি জিনিস অতি প্রিয়, ১. আপনার চেহারা মোবারক দেখা, ২. আমার অর্থ সম্পদ আপনার জন্য খরচ করা, ৩. আমার কন্যা আপনার স্ত্রী হওয়া। অন্য রেওয়ায়াতে আছে আপনার উপর দুরূদ শরীফ পড়া।

হযরত উমর রা. বলেলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ সা., আমার কাছেও তিনটি জিনিস অতি প্রিয়, ১. সৎকাজের আদেশ করা ২. অসৎকাজ হতে নিষেধ করা। ৩. পুরাতন কাপড় পরিধান করা। অন্য রেওয়ায়াতে আছে ন্যায় বিচার কায়েম করা।

হযরত উসমান রা. বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ সা., আমার নিকটও তিনটি জিনিস অতি প্রিয়, ক্ষুধার্তকে খানা খাওয়ানো। ২. বস্ত্রহীনকে বস্ত্র দান করা। অন্য রিওয়াতে আছে ছালামের প্রচলন করা। ৩. কোরআন তেলাওয়াত করা। অন্য রেওয়ায়াতে আছে রাতে নামায পড়া।

হযরত আলী রা. বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ সা. আমার নিকটও তিনটি জিনিস অতি প্রিয়, ১. দুশমনের উপর তলোয়ার চালানো। ২. মেহমানদারী করানো, ৩. গরমের দিনে রোজা রাখা।

এমন সময় জিবরাইল আ. তাশরীফ এনে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ সা.! আমাকে আল্লাহ পাঠিয়েছেন। অত:পর বললেন, আমি যদি দুনিয়াবাসীদের একজন হতাম তাহলে কি পছন্দ করতাম তা বলবো কি? হুজুর সা. বললেন, বলুন, জিবরাইল আ. বললেন, ১. পথ হারানোকে পথের সন্ধান দেয়া। ২. গরীব ইবাদতকারীদেরকে মোহাব্বত করা। ৩. সন্তান সন্ততিওয়ালা গরীবদের সাহায্য করা। অন্য রিওয়ায়াতে আছে জিব্রাইল আ. বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ সা., আমার নিকটও তিনটি জিনিস প্রিয়, নবীদের নিকট অবতরণ করা। ২. রাসূলদের নিকট আল্লাহর পয়গাম পৌঁছানো। ৩. আল্লাহর হামদ ও শুকরে লিপ্ত থাকা।

আল্লাহর নিকটও তিনটি জিনিস প্রিয়। ১. জান্ মালও শক্তি আল্লাহর রাস্তায় খরচ করা। ২. গোনাহের জন্য অনুতপ্ত হয়ে ক্রন্দন করা। ৩. ক্ষুধার্ত অবস্থায় ছবর করা।

অন্য রিওয়ায়াতে আছে, আল্লাহর নিকট তিনটি জিনিস অতি প্রিয়, ১. জিকিরকারীর জবান ২. কৃতজ্ঞ অন্তর ৩. ধৈর্যশীল।

ইমাম আবু হানিফ রাহ. বললেন, আমার নিকটও তিনটি জিনিস অতি প্রিয়, ১. গভীর রাত পর্যন্ত ইলম হাসিল করা। ২. অন্তরকে দুনিয়ার মোহাব্বত থেকে খালি করা, ৩. আশা ও বড়ত্ব বর্জন করা।

ইমাম মালেক রা. বললেন, আমার নিকটও তিনটি জিনিস অতি প্রিয়, রাসূল সা. এর পবিত্র রওজায় হাজির হওয়া। ২. রাসূলের পরিবারকে তাজিম করা। ৩. রাসূলের রওজার খাদেম হওয়া।

ইমাম শাফেয়ী রাহ. বললেন, আমার নিকটও তিনটি জিনিস অতি প্রিয়, ১. মানুষের সাথে সৌহার্দপূর্ণ আচরণ করা। ২. কষ্টদায়ক কথা ছেড়ে দেওয়া। ৩. তাসাউফের পথ অনুসরণ করা।

ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রহ. বললেন, আমার নিকটও তিনটি জিনিস অতি প্রিয়, ১. হুজুর সা. এর হাদীসমূহ এর ওপর পূর্ণাঙ্গভাবে আমল করা,

২. হুজুর সা. এর নূরের দ্বারা বরকত হাসিল করা। ৩. হুজুর সা. এর নির্দেশিত পথে চলা। (মায়ারেফুস সুলতান, ৮/৪, জান্নাত কা মানাযার-৪৮২)

প্রিয় পাঠক! এবর আপনি সিদ্ধান্ত নিন। আপনার প্রিয় জিনিস কোনটি। আফসোসের সাথে বলতে হয় যদি আমাদেরকে প্রিয় বস্তু নির্বাচন করতে বলা হয়, তাহলে ক্রীড়া জগতে থেকে শুরু করে খাদ্য তালিকার সবকিছু তাতে স্থান পাবে। কোরআন হাদিসের বর্ণিত কোন বিষয় তাতে স্থান পাবে না। অনেক সময় পত্র পত্রিকায় বিভিন্ন গায়ক গায়িকা এবং রাজনীতিবীদদের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়। তাতে একটি প্রশ্ন থাকে আপনাদের প্রিয় ব্যক্তি কে? তখন কেউ হয়তো কোন গায়কের নাম বলবে। কেউ নায়কের নাম বলে। কেউ কোন কবির নাম বলে।

আমার প্রিয় ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বা সাহাবায়ে কেরাম, একথা বলার লোকের খুবই অভাব। অবশেষে একটি হাদীসের উদ্ধৃত দিয়ে শেষ করছি। রাসূল সা. বলেন, যে যাকে ভালবাসবে তার সাথে তার হাশর হবে।

প্রিয় পাঠক! কার সাথে হাশরের মাঠে থাকতে চান আগে এই সিদ্ধান্ত নিন তারপর প্রিয় বস্তু নির্ধারণ করুন।

মুক্তির আজব কৌশল

এক ব্যবসায়ী শখ করে একটি ময়না পাখি পুষতো। ময়নাকে কথা শিখানোর ফলে সে বিভিন্ন কথা বলতে পারতো। একবার লোকটি ব্যবসার কাজে সুদানে সফরের ইচ্ছা করলো এবং ময়নাকে তা জানালো। তখন ময়না তাকে বললো, যদি পথে ঘাটে কোথাও আমার জাতি ভাইয়ের সাক্ষাত পান তাহলে আমার পক্ষ থেকে সালাম পৌঁছিয়ে দিবেন। আর বলবেন তোমার জাতি ভাই খাঁচায় বন্দি। তার মুক্তির কোন পথ নেই।

লোকটি সফরে বের হয়ে পথে দেখতে পেল একদল ময়না। সে তার খাঁচার ময়নার কথাগুলো তাদের নিকট পৌঁছিয়ে দিলো। কথাগুলো শুনা মাত্রই সবগুলো ময়না পাখা নাড়তে নাড়াতে মরে গেল। লোকটি খুব চিন্তিত

হয়ে পড়লো। আর ভাবতে লাগলো কেন কথাগুলো বলা মাত্রই সব ময়না মারা গলে এর কারণ কি? আমি তো কিছুই বুঝাতে পারলাম না।

পরে যখন সে বাড়ি ফিরে আসলো, তখন খাঁচার ময়নাকে পুরা ঘটনাটি শুনালো। খাঁচার ময়নাও ঘটনাটি শুনা মাত্রই মরে গেল, লোকটি পড়ল মহাবিপদে। এত দিনের পোষা ময়নাটিও মরে গেল যা তাকে খুব ব্যথিত করে তুলল। যাক মরা জিনিস তো আর খাঁচায় রাখা যায় না। তাই ময়নাকে খাঁচা থেকে বের করে ফেলে দিলো। ফেলে দেওয়ার সাথে সাথেই ময়না উড়ে গাছের ডালে গিয়ে বসল। আর মালিককে বলতে লাগলো, আমার জাতি ভাই একজনও মরে নাই। বরং মরার ভান করে আমাকে মুক্তির কৌশল শিখিয়েছে অর্থাৎ তুমি মরার ভান করো তাতে তোমার মালিক তোমাকে মৃত মনে করে ফেলে দিবে আর তাতেই রয়েছে তোমার মুক্তি।

(সূত্রঃ নুজহাতুল মাজালিস ৪৮ পৃষ্ঠা)

প্রিয় পাঠক! তাই আসুন আমরাও মৃত্যুর আগে মৃত্যুর আগে মৃত্যুর ভান করি, তাহলে মৃত্যু কষ্ট এবং কবরের কষ্ট হতে মুক্তি পাবো। তাই তো হক্কানী পীর সাহেবেরা মৃত্যুর ভান ধরার জন্য বিভিন্ন ধরনের মোরাকাবা ও রিয়াজতের সবক দিয়ে থাকেন।

প্রিয় পাঠক! মৃত্যুর আগে মৃত্যুর ভান কিভাবে করতে হয় তা একটু শিখে নেই।

ইমাম গজ্জালী রহ. বলেন, মউতের ব্যাপারটি বড় কঠিন। অথচ মানুষ ইহা হতে একেবারেই গাফেল। প্রথমত, বিভিন্ন ঝামেলায় উহাকে ভুলে যায়। আর যদি স্বরণ করেও তবু অন্য মনস্ক হওয়ার দরুণ কোন ফায়দাও হয় না। কাজেই সর্বদিক হতে মনকে খালি করে এভাবে উহার চিন্তা করবে যেমন ইহা একেবারেই সম্মুখে। সেটা এভাবে, প্রথমে আপন আত্মীয় স্বজন ও মৃত বন্ধু-বান্ধবদের বিষয় চিন্তা করবে যে, কিভাবে তাদেরকে খাটিয়ার মধ্যে উঠিয়ে পরে মাটির নীচে কবর দেয়া হয়েছে। তারপর তাদের সুন্দর সুন্দর ছুরত ও উচ্চ মর্যাদার খেয়াল করবে, যে আজ কিভাবে মাটি তারে সুরতকে বিগড়িয়ে দিয়েছে। তাদের শরীর খণ্ড বিখন্ড হয়ে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গিয়েছে। এভাবে তারা ছেলে মেয়েকে এতীম করে, স্ত্রীকে বিধবা করে এবং

আত্মীয় স্বজনকে কাঁদিয়ে চলে গিয়েছে। তাদের সাজ সরঞ্জাম কাপড়-চোপড় সবকিছুই পড়ে রয়েছে। এ অবস্থা একদিন আমারও হবে। কিভাবে তারা মজলিশে ঠাট্টা মেরে হেসে দুনিয়ার মজায় বিভোর থাকত, মৃত্যুকে স্বরণ করতো না। অথচ আজ মাটিতে গিয়েছে। কিভাবে যৌবনের নেশায় মত্ত ছিল। আজ জিজ্ঞাসা করার মত কেউ নেই। দুনিয়ার ঝামেলায় কত ব্যস্ত ছিল। আজ তারা সেখানে ভিন্নভাবে পড়ে আছে। পা পৃথক হয়ে গেছে, জিহ্বাকে পোকায় খেয়ে ফেলেছে। কিভাবে দাঁত বের করে খিলখিল করে হাসতো, সে দাঁত পৃথক হয়ে গিয়েছে। কত রকম চিন্তা করতো, শত বসরের চিন্তা করতো, অথচ তার জানা ছিল না যে, কাল তার পরিণাম কি হবে! আজ তারা কি অবস্থায় আছে দুনিয়াবাসী কেউ বলতে পারে না।

অতএব, আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে মৃত্যুর আগে মৃত্যুর প্রস্তুতি নেওয়ার তৌফিক দান করুন। পরিশেষে একটি আয়াতের দ্বারা শেষ করছি।

أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ

অর্থাৎ যেখানে তোমরা থাক না কেন মৃত্যু তোমাদেরকে ধরবেই, যদিও তোমার অবস্থান কর সুউচ্ছ দূর্গে।

ঢাকনা নিয়ে টানাটানি

একবার কোন এক এলাকায় শবেবরাত উপলক্ষ্যে খিচুড়ী পাকানোর সিদ্ধান্ত হলো, যথারীতি খিচুড়ী পাক শুরু হল। ঐ এলাকায় ছিলো দুই মাতব্বর। তারাই পাক শাকের তদারকী করলো। রান্না শেষ হলে পরে উভয় মাতব্বর দলবল নিয়ে আসলো খিচুড়ী দেখার জন্য। এরই মধ্যে এক মাতব্বর হুকুম দিল, পাতিলের ঢাকনা উঠিয়ে ফেল তাহলে গরম বাষ্প বের হয়ে যাবে। আরেক মাতব্বর বললো না ঢাকনা দিয়ে রাখা নতুবা খিচুড়ী ঠান্ডা হয়ে যাবে। এভাবে উভয়ের মধ্যে শুরু হলো তর্ক, তারপর সংঘর্ষ। একজনের হুকুম ঢাকনা দিয়ে রাখ আরেক জনের হুকুম তুলে রাখ। শুরু হল টনাটানি। এক গ্রুপ ঢাকনা দিয়ে রাখে আরেক গ্রুপ ঢাকনা উঠায়, এভাবে ঢাকনা নিয়ে টানাটানি করতে করতে উভয় গ্রুপ ঢাকনা নিয়ে পাতিলের

থেকে প্রায় আধা মাইল দূরে চলে গেল। এ দিকে দুটি কুকুর পাতিলের কাছে এসে লোকজন না দেখে সব খিচুড়ী খেয়ে সাবাড় করে নিল।

পরে উভয় গ্রুপ সিদ্ধান্ত নিলো পাতিল ঢেকে রাখবে। তাই উভয় গ্রুপ পাতিলের কাছে আসলো। এসে দেখে যা নিয়ে এত ঝগড়া সে খিচুড়ী কুত্তা খেয়ে সাবাড় করেছে। এবার উভয় গ্রুপ অনুতপ্ত হলো। কিন্তু তাতে লাভ হবে কি খিচুড়ী তো আর ফিরে পাচ্ছে না।

প্রিয় পাঠক! আজ ইসলামেরও একই অবস্থা। আজ আমরা ইসলামের ছোট খাটো বিষয় নিয়ে এতো ইখতেলাফ করছি যা আমাদেরকে ইসলাম এর মূল থেকে অনেক দূরে সরিয়ে দিয়েছে। আর আমাদের এই দূর্বলতার সুযোগেই কাফেররা ইসলাম ধ্বংস করার পায়তারা করছে। যা এখন আর দলিল দ্বারা বুঝানোর প্রয়োজন নেই। তাই আসুন, ছোট খাটো মতবিরোধ ভুলে গিয়ে ঐক্যবদ্ধ হই। তাহলেই ইসলাম টিকে থাকবে এবং আমরাও মুসলমান হিসাবে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারবো। কেননা আল্লাহ তাআলা তাঁর কালামে বলেছেন,

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا

অর্থাৎ তোমরা সকলে আল্লাহর রুজ্জুকে মজবুত করে ধরো বিচ্ছিন্ন হয়ো না।

সৎমায়ের আদরের রহস্য

জনৈক মহিলার দুইটি ছেলে ছিল। একটি নিজের ছেলে অপরটি সতীনের ছেলে। সে সতীনের ছেলেটিকে সবসময় কোলে রাখতো। উঠতে বসতে কোথাও বেড়াতে গেলে ছেলেটিকে কখনো কোন জায়গায় নামাতো না। এমনকি কোলে নিয়েই সংসারের যাবতীয় কাজ চালিয়ে যেতো।

পাড়ায় বেড়াতে গেলে সতীনের ছেলেটিকে কোলে আর নিজের ছেলেটিকে হাতে ধরে হাঁটিয়ে নিয়ে যেত। পাড়ার মেয়েরা তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। সবাই বলতো, মেয়েটির একটু ও হিংসা নাই। সতীনের ছেলেকে এত আদর করে আর নিজের ছেলেকে হাঁটিয়ে নিয়ে বেড়ায়। সতীনের

ছেলেকে এত আদর করতে আর কোথাও দেখা যায় না। এরূপ সতী-সাধ্বী নারী আর হয় না।

একদিন পাড়ার একটি মেয়ে এসে গোপনে সহানুভূতি স্বরূপ বললো, আপা,নিজের ছেলেকে অবহেলা আর সতীনের ছেলেকে এত আদর করা ঠিক না। তাতে নিজের ক্ষতি। মহিলাটি বললো, না আপা, এটা আমার ছেলের প্রতি অবহেলা নয়। নিজের ছেলেটিকে হাঁটিয়ে নিয়ে বেড়াই যেন তার পা শক্ত হয় এব স্বাবলম্বী হয়ে সমাজে দাঁড়াতে পারে। আর সতীনের ছেলেকে কোলে নিয়ে রাখি যেন সে কোন দিন হাঁটতে না শিখে। কোলে থাকতে থাকতে অচল এবং পঙ্গু হয়ে যায়। কোনদিন যেন সে সমাজে মাথা তুলে দাঁড়াতে না পারে। এটা সতীনের ছেলের প্রতি আদর নয়। কিন্তু মানুষ বুঝতে না পেরে আমার প্রশংসা করছে। তাতে আমি কি করবো বল?

অনুরূপভাবে সরকার জনগণের আবাসের জন্য সুদের প্রচলন করেছে বিনা পরিশ্রমে। তাদেরকে সুদনীতি, প্রাইজ বন্ড, বোনাস, ইন্টারেষ্ট ইত্যাদি নাম দিয়ে বিভিন্ন আর্থিক সুবিধা দিচ্ছে। প্রকাশ্য দৃষ্টিতে মনে হয় সরকার জনগণের উপকার করছে। প্রকারন্তে এটাও বিমাতার আদরের শামিল। বিনা পরিশ্রমে এই সব সুবিধা পেয়ে জনগণ অলস অকর্মণ্য এবং অক্ষম হয়ে দিন দিন ধ্বংসের দিকে ধাবিত হচ্ছে। অপর দিকে সুদের মত মহাপাপে লিপ্ত হয়ে ইমান ও আমল ধ্বংস হয়ে আখেরাত বরবাদ হচ্ছে। বিদেশীরা করছে সরকারের সাথে বিমাতাসুলভ আচরণ। আর সরকার জনগণের সাথে করছে বিমাতাসুলভ আচরণ। বিমাতাসুলভ আচরণে দেশ ও জাতি আজ জর্জরিত। আল্লাহ্ আমাদেরকে বিমাতাসূলভ আচরণ থেকে হিফাজত করুন। (আমিন)

হযরত মূসা আ. ও হযরত খিজির আ.

বোখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত উবাই ইবনে কা'ব রা. এর বর্ণনা। রাসূল সা. বলেন, একদিন মূসা আ. বনী ইসরাইলের এক সভায় ভাষণ দিচ্ছিলেন। জনৈক ব্যক্তি তাকে প্রশ্ন করলেন বর্তমান দুনিয়ায় সর্বাধিক জ্ঞানী কে? হযরত মূসা আ. এর জানামতে তার চাইতে অধিক জ্ঞানী আর কেউ ছিলেন না। কেননা, তিনি ছিলেন সে যুগের নবী। তাই বললেন, আমিই

সবার চাইতে অধিক জ্ঞানী। আল্লাহ তায়ালা তার এই জবাব পছন্দ করলেন না। এখানে বিষয়টি আল্লাহর উপর ছেড়ে দেওয়াই ছিল আদব। অর্থাৎ একথা বলে দেয়া উচিত ছিল যে, আল্লাহই ভাল জানেন, কে অধিক জ্ঞানী। এ জওয়াবের কারণে আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে মুসা আ. এর উপর ওহী নাযিল হল যে, দুই নদীর মিলনস্থলে অবস্থানকারী আমার এক বান্দা আপনার চাইতে অধিক জ্ঞানী। একথা শুনে মূসা আ. দোয়া করলেন যে, তিনি অধিক জ্ঞানী হলে তার কাছ থেকে জ্ঞান লাভের জন্য সফর করা উচিত। তাই বললেন, ইয়া আল্লাহ! আমাকে তার ঠিকানা বলে দিন। আল্লাহ তায়ালা বললেন, থলের মধ্যে একটা মাছ নিয়ে নিন এবং দুই সমুদ্রের সঙ্গমস্থলের দিকে সফর করুন। যেখানে পৌঁছার পর মাছটি নিরুদ্দেশ হয়ে যাবে, সেখানেই আমার এই বান্দার সাক্ষাৎ পাবেন।

মুসা আ. নির্দেশ মত থলের মধ্যে একটি মাছ নিয়ে রওয়ানা হয়ে গেলেন। তার সাথে খাদেম ইউশা ইবনে নুনও ছিলেন। পথিমধ্যে মুসা আ.একটি প্রস্তর খন্ডের উপর মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়লেন। এখানে হঠাৎ মাছটি নড়াচড়া করে উঠল এবং থলে থেকে বের হয়ে সমুদ্রে ঝাপিয়ে পড়লো। মাছটি জীবিত হয়ে সমুদ্রে চলে যাওয়ার সাথে সাথে আরও একটি মুজেজা প্রকাশ পেল যে, মাছটি সমুদ্রের যে পথ দিয়ে চলে গেল, আল্লাহ পাক সে পথে পানির স্রোত বন্ধ করে দিলেন। ফলে, সেখানের পানির মধ্যে একটি সুড়ঙ্গের মত হয়ে গেল। ইউশা ইবনে নূন এই ঘটনা নিরীক্ষণ করছিলেন। মুসা আ. নিদ্রিত ছিলেন, যখন জাগ্রত হলেন তখন ইউশা ইবনে নুন মাছের এই আশ্চর্যজনক ঘটনা তাঁর কাছে বলতে ভুলে গেলন এবং সেখান থেকে সামনে রওনা হয়ে গেলেন।

পূর্ণ একদিন একরাত সফর করার পর সকল বেলা মুসা আ. খাদেমকে বললেন, আমাদের নাস্তা আন। এই সফরে যথেষ্ট ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। নাস্তা চাওয়ার পর ইউশা ইবনে নূনের মাছের ঘটনা মনে পড়লো। তিনি ভুলে যাওয়ার পর ওজর পেশ করে বললেন, শয়তান আমাকে ভুলিয়ে দিয়েছে। অত:পর বললেন, মৃত মাছটি জীবিত হয়ে আর্শ্চজনকভাবে সমুদ্রে চলে গেল। তখন মূসা আ. বললেন, সে স্থানটিই তো আমাদের লক্ষ্য ছিল। (অর্থাৎ মাছের জীবিত হয়ে নিরুদ্দেশে চলে যাওয়ার স্থানটি) পাওয়ার জন্য

পূর্বের পথ ধরে চললেন। প্রস্তরখন্ডের নিকট পৌঁছে দেখলেন এক ব্যক্তি আপাদমস্তক চাদরে আবৃত হয়ে শুয়ে আছেন। মূসা আ. তদবস্থায় সালাম দিলে শায়িত ব্যক্তি বললেন, এই জনমানবহীন প্রান্তরে সালাম কোথা থেকে এল? মূসা আ. বললেন, আমি বনী ইসরাঈলের মূসা। আমি আপনার কাছে বিশেষ জ্ঞান অর্জন করতে এসেছি। যা আল্লাহ তায়ালা আপনাকে শিক্ষা দিয়েছেন। এই ব্যক্তি ছিলেন খিজির আ.।

হযরত খিজির আ. বললেন, আপনি আমার সাথে ধৈর্য ধরতে পারবেন না। হে মূসা! আমাকে আল্লাহ তায়ালা এমন জ্ঞান দান করেছেন যা আপনার কাছে নেই। পক্ষান্তরে আপনাকে এমন জ্ঞান দিয়েছেন যা আমি জানি না। মূসা আ. বললেন, ইনশাআল্লাহ্, আপনি আমাকে ধৈর্যশীল পাবেন। আমি কোন কাজে আপনার বিরোধিতা করব না। হযরত খিজির আ. বললেন, যদি আপনি আমার সাথে থাকতে চান তবে কোন বিষয়ে আমাকে প্রশ্ন করতে পারবেন না। যে পর্যন্ত আমি নিজে তার স্বরূপ বা প্রকৃত ঘটনা বলে না দেই।

একথা বলার পর উভয়ে সমুদ্রের পাড় ধরে চলতে লাগলেন। ঘটনাক্রমে একটি নৌকা এল। তারা নৌকায় আরোহনের ব্যাপারে কথাবার্তা বললেন, মাঝিরা হযরত খিজির আ. চেনে ফেললেন এবং এক রকম পারিশ্রমিক ছাড়াই তাঁদেরকে নৌকায় তুলে নিলেন। নৌকায় চড়েই খিজির আ.কুড়ালের সাহায্যে নৌকার একটি তক্তা তুলে ফেললেন। এতে হযরত মুসা আ. স্থির থাকতে পারলেন না।তিনি বললেন, তারা কোন প্রকার পারিশ্রমিক ছাড়াই আমাদেরকে নৌকায় তুলে নিয়েছে। আপনি কি এরই প্রতিদানে তাদের নৌকা ভেঙ্গে দিলেন যাতে সবাই ডুবে মরে? খিজির আ. বললেন, আমি পূর্বেই বলেছিলাম, আপনি আমার সাথে ধৈর্য ধরতে পারবেন না। তখন মূসা আ. ওযর পেশ করলেন, আমি আমার ওয়াদার কথা ভুলে গিয়েছিলাম। আমার প্রতি রুষ্ট হবেন না।

রাসূল সা. বললেন, ইতোমধ্যে একটি পাখি এসে নৌকার একপ্রান্তে বসল এবং সমুদ্র হতে এক চুঞ্চু পরিমাণ পানি তুলে নিল। খিযির আ. মুসা আ. কে বললেন, আমার জ্ঞান এবং আপনার জ্ঞান উভয় মিলে আল্লাহর

জ্ঞানের মোকাবেলায় এমন তুলনাহীন, যেমনটি পাখির ঠোটের পানির সঙ্গে সমুদ্রের পানি। অত:পর তাঁরা নৌকা থেকে নেমে সমুদ্রের কুলে হাঁটতে লাগলেন। হঠাৎ খিজির আ. একটি বালককে অন্য বালকদের সাথে খেলা করতে দেখলেন। খিজির আ. স্বহস্তে বালকটির মস্তক (শির) তার দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেললেন। মূসা আ. বললেন, আপনি একটি নিষ্পাপ প্রাণকে বিনা অপরাধে হত্যা করেছেন, এ যে বিরাট গোনাহের কাজ করলেন। খিযির আ. বললেন, আমি তো পূর্বে বলেছিলাম আপনি আমার সাথে ধৈর্য ধরতে পারবেন না। মূসা আ. দেখলেন এ ব্যাপারটি পূর্বাপেক্ষা গুরুতর, তাই বললেন, এরপর যদি কোন প্রশ্ন করি তবে আপনি আমাকে পৃথক করে দিবেন।

অত:পর আবার চলতে লাগলেন। এক গ্রাম দিয়ে যাওয়ার সময় তারা গ্রামবাসীদের কাছে খাবার চাইলেন। তারা দিতে অস্বীকার করল। হযরত খিজির আ. এই গ্রামে একটি প্রাচিরকে পতনোন্মখ দেখতে পেলেন। তিনি নিজ হাতে প্রাচিরটি সোজা করে দিলেন। মূসা আ. বিস্মিত হয়ে বললেন, আমরা তাদের কাছে খাবার চাইলে তারা তা দিতে অস্বীকার করল, অথচ আপনি তাদেরকে এত বড় কাজ করে দিলেন। ইচ্ছা করলে এর পারিশ্রমিক নিতে পারতেন। খিজির আ. বললেন, এখন শর্ত পূর্ণ হয়ে গেছে। এটাই আামার এবং আপনার মধ্যে বিচ্ছেদের সময়।

এরপর খিজির আ. উপরোক্ত ঘটনাত্রয়ের রহস্য মুসা আ. কাছে বর্ণনা করে বললেন, এই নৌকাটি এক দরিদ্রের ছিল। তারা ছিল দশ ভাই। তন্মধ্যে পাঁচজন ছিল বিকলাঙ্গ। অবশিষ্ট পাঁচ ভাই মেহনত করে, সবার জীবিকার ব্যবস্থা করত। নদীতে নৌকা চালিয়ে ভাড়া উপার্জন করাই ছিল তাদের একমাত্র পেশা। নৌকাটি যে, দিকে যাচ্ছিল, সেখানে একজন জালেম বাদশাহ এই নদীতে চলাচলকারী সব ভালো নৌকা ছিনিয়ে নিতো। এই কারণে নৌকার একদিকে ক্রটিযুক্ত করে দেই। যেন দরিদ্ররা বিপদের হাত থেকে বেঁচে যায়।

যে বালকটিকে হত্যা করি, তার স্বরূপ এই যে, তার প্রকৃতিতে কুফর ও পিতা মাতার আবাধ্যতা নিহিত ছিল। তার পিতা-মাতা ছিল সৎকর্মশীল।

পিতা-মাতাকে বিব্রত করবে এবং কষ্ট দেবে। সে কুফরে লিপ্ত হয়ে পিতামাতার জন্য ফেৎনা হয়ে দাঁড়াবে এবং তার ভালবাসায় পিতা-মাতার ও ইমান বিপন্ন হয়ে পড়বে। এজন্য আমি ইচ্ছা করলাম যে, আল্লাহ তায়ালা এই সৎকর্মপরায়ণ পিতা-মাতাকে এ ছেলের চাইতে উত্তম সন্তান দান করুক। যার কাজ কর্ম ও চরিত্র হবে পবিত্র এবং সে পিতা মাতার হকও পূর্ণ করবে। নিহত ছেলেটির নাম ছিল হাইসুন। হাইসুন এর পরিবর্তে আল্লাহ তায়ালা তার পিতা-মাতাকে একটি কন্যা দান করেন, পরবর্তী কালে যার গর্ভে দুইজন নবী জন্মগ্রহণ করেন। তার বিবাহ হয়েছিল এক পয়গম্বরের সাথে। তার বংশে সত্তরজন পয়গম্বর হয়েছিলেন। কোন কোন রেওয়ায়েতে রয়েছে যে, তার গর্ভ থেকে জন্মগ্রহণকারী নবীর মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা একটি বিরাট উম্মতকে হেদায়েত দান করেন।

আর প্রাচীরের ব্যাপারটি, সেটি ছিল নগরের দুইজন পিতৃহীন বালকের। উহার নিচে ছিল তাদের গুপ্ত ধন এবং তাদের বাবা ছিল সৎকর্মপরায়ন। তাই পতনোন্মুখ দেয়ালকে সোজা করে দিয়ে তাদের গুপ্তধনের হেফাজতের ব্যবস্থা করলাম। পিতা-মাতার সৎকর্মের উপর সন্তান সন্ততিরাও হেদায়াত পায়।

মুহাম্মাদ ইবনে মুনকাদির বলেন, আল্লাহ তায়ালা এক বান্দার সৎকর্ম পরায়নতার কারণে তার পরবর্তী সন্তান সন্ততি বংশধর ও প্রতিবেশীদের হেফাযত করেন। (মাযহারী)

হযরত ইবনে আব্বাস রা. বলেন, খিজির আ. যে পতনোন্মুখ প্রাচীর সোজা করেছিলেন, তার নিচে ছিল স্বর্ণের একটি ফলক। তাতে এতিম ছেলেদের জন্য নিম্নলিখিত উপদেশ বাক্যসমূহ লিখিত ছিল।

১. বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।

২. আমি আশ্চর্যবোধ করি ঐ ব্যক্তির ব্যাপারটি যে মউতকে নিশ্চিতভাবে জেনেও হাসে।

৩. আমার আশ্চর্য লাগে ঐ ব্যক্তির জন্য যে ইহা জানে যে, সবকিছু আল্লাহর তরফ হতে নির্দিষ্ট হয়ে আছে। (অর্থাৎ তকদীরকে বিশ্বাস করে) তবুও তার কোন জিনিস হাসেল না হলে কেন আফসোস করে।

৪. আমার আশ্চর্য লাগে ঐ ব্যক্তির বিষয়ে যে, উহা জানে যে, এই দুনিয়া একদিন শেষ হবে যাবে, তবুও সে দুনিয়ার প্রতি আকৃষ্ট হয়।

৫. আমার আশ্চর্য লাগে এ ব্যক্তির জন্য যার আখেরাতে হিসাব দেয়ার উপর পূর্ণ বিশ্বাস আছে, অথচ তবুও সে ধন সম্পদ জমা করে।

৬. আমার আশ্চর্য লাগে ঐ ব্যক্তির জন্য যে জাহান্নামের আগুন বিশ্বাস করে তবুও সে কেমন করে অন্য জিনিসের আলোচনা করে।

৭. আমার আশ্চর্য লাগে ঐ ব্যক্তির জন্য যে শয়তানকে শত্রু জানা সত্বেও তার অনুসরণ করে।

হযরত মুসা আ. এর নিকট থেকে চলে যাওয়ার আগে খিজির আ. তাকে লক্ষ করে কতগুলো উপদেশ দিয়েছিলেন। সেই মূল্যবান উপদেশ বাণীগুলো ছিল নিম্নরূপ :

* অপ্রয়োজনে কারো নিকট না যাওয়া।
* সর্বাবস্থায় তোষামোদ পরিহার করে চলবে।
* অনর্থক হাসাহাসি করা মূর্খতার পরিচায়ক।
* কেউ ভুল করলে এ জন্য তাকে খোঁটা দেওয়া অনুচিত।
* কোন পাপ কাজ সংঘটিত হয়ে গেলে অনুশোচনায় ক্রন্দন করা কর্তব্য।
* আজকের কাজ আগামীকালের জন্য রেখে দেওয়া নিন্দনীয়।
* মুখ ভার করে রাখার অভ্যাস অবশ্যই পরিত্যজ্য।
* লোভ লালসা বর্জন করে চলতে হবে।
* সবসময় অন্যের উপকারের চিন্তা করতে হবে। কারো ক্ষতির চিন্তা করা যাবে না।

মূর্তিপূজারির ঘটনা

হিন্দুস্থানের এক মূর্তিপূজক দীর্ঘদিন যাবৎ মূর্তিপূজায় লিপ্ত ছিল। এভাবেই দিন কেটে যাচ্ছিল। একদিন মূর্তিকে লক্ষ করে বলল, হে আমার মাবূদ! তুমি আমার দূর্বলতার প্রতি দয়া করো; আমার ডাকের জবাব দাও। এ কথা বলার পর কোন প্রকার উত্তর পেল না। তৎক্ষাণৎ ঐ

মূর্তিপূজক আসমানের দিকে তাকিয়ে বলতে লাগল يا صمدُ এবং করুণ সূরে ভক্তি ভরে আল্লাহকে উদ্দেশ্য করে বললো, হে প্রভু! আজ অনেক দিন যাবত এই মূর্তির উপসনা করছি। কিন্তু আমার কোন প্রকার উপকার হয়নি। আজ তোমাকে ياصمد বলে ডাকছি। মূর্তিপূজকের এই কথা বলার সাথে সাথেই আসমান থেকে অদৃশ্য আওয়ায আসলো لبيك يا عبدى অর্থাৎ আমি উপস্থিত হে বান্দা! أطلب ما تريد অর্থাৎ, তোমার যা ইচ্ছা চাও।

তখন ফেরেশতারা বলল, হে আল্লাহ! লোকটি দীর্ঘদিন যাবৎ মূর্তিপূজায় লিপ্ত ছিল। কিন্তু কোন প্রকার উপকার পায়নি। আর ياصمد বলে ডাকার সাথেই আপনি জবাব দিয়ে দিলেন এর কারণ কি? উত্তরে আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামিন বললেন, দেখ, আমি যদি তার ডাকে সাড়া না দেই তাহলে আমার আর মূর্তির মাঝে পার্থক্য রইল কোথায়?

পাঠকবৃন্দ! এই ঘটনা দ্বারা বুঝতে পারলেন যে, আল্লাহ তায়ালা কত মেহেরবান আর দয়ালু। একজন কট্টর মূর্তিপূজক একবার মাত্র ইখলাসের সাথে আল্লাহ তায়ালাকে ডেকেছে। আর সাথে সাথেই আল্লাহ পাক তার ডাকে সাড়া দিয়েছেন। অতএব, আমরাও যদি ইখলাসের সাথে আল্লাহকে ডাকি তাহলে নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা আমাদের ডাকেও সাড়া দিবেন। এই জন্য চাই ইখলাস ও আল্লাহর হুকুম মানার পরিপূর্ণ মন মানসকিতা।

(সূত্রঃ মায়ারেফুস সুলতান, ৭/৩৯, নুজহাতুল মাজালেস ৭২ পৃষ্ঠা)

ঘুষ খাওয়ার কৌশল

এক আমলা খুব নামাযি ছিল। ফজরের নামায আদায়ের পর থেকে ইশরাক পর্যন্ত জায়নামাজে বসে থাকতো। কারো সাথে কথা বলতো না। কেননা, পীর সাহেব অজিফা পাঠের সময় কথা বলতে নিষেধ করেছেন। তদবীরকারীরা এ সময়ই আসতো এবং ঘুষ দিতো। লোকটি অজিফার ব্যাঘাত ঘটবে তাই মুখে কিছুই বলত না বরং আঙ্গুলে ইশারা করতো দুইশ'র জন্য দুই আঙ্গুল, পাঁচশ'র জন্য পাঁচ অঙ্গুল দেখাতো। যদি লোকেরা বলতো একশ নিন তখন দুই আঙ্গুল দেখিয়ে বুঝিয়ে দিতো না কম হবে না, দুই শতই লাগবে। বাধ্য হয়ে লোকেরা যা বলতো তাই দিত। তারপর সে ঘুষের

টাকা হাতে না নিয়ে ইশারা করে দিত জায়নামাজের নীচে রাখার জন্য। হয়তো লোকটি ভাবত এভাবে ঘুষ খাওয়া জায়েজ আছে। (সূত্রঃ মাওয়ায়েজে থানভী)

প্রিয় পাঠক! আজ ঘুষ ক্যান্সারে পরিণত হয়েছে। যা সমাজের রন্ধে রন্ধে প্রবেশ করে জনসাধারণকে কুরেকুরে খাচ্ছে। আজ প্রশাসনের উপর স্তর থেকে নিয়ে নিচ স্তর পর্যন্ত তথা সরকারী-বেসরকারী সবখানেই ঘুষের প্রতিযোগিতা চলছে। ঘুষ ছাড়া কোন কাজ করানো কঠিন হয়ে পড়েছে। অথচ ঘুষ খাওয়া হারাম এবং কবিরা গোনাহ।

বর্তমানে যুগের পরিবর্তনের সাথে সাথে ঘুষের নাম পরিবর্তন হয়েছে। আমাদের সমাজে তথা অফিস, আদালতে, কোট-কাচারী, মিল-ফ্যাক্টরী, বাসা বাড়ী আচার-অনুষ্ঠানে ও রাস্তা ঘাটে আমার জানা মতে ২৯টি নামে ঘুষ গ্রহণ করা হয়। আপনাদের সর্তকতার জন্য নামগুলো উল্লেখ করছি।

১. উপরি আয়ঃ ছেলেটাতো দেখতে ভালই মনে হলো তবে বেতন যে অনেক কম। মেয়ে নিয়ে ঢাকা শহরে চলতে পারবে তো? ও কথা বলবেন না সাহেব; ছেলের ভাল উপরি আয় (ঘুষ) আছে।

চাকরী ইন্টারভিউ কার্ড পেয়েছি খালেদ দোয়া করিস চাকরীটা যাতে হয়। শোন, এ যুগে পরীক্ষা-টরীক্ষা দিয়ে চাকরী পাওয়ার কথা ভুলে যাও। চাকরী নিতে হলে স্যারের বাসার ঠিকানা নিয়ে ডাইরেক্টর স্যারের সাথে কন্ট্রাক্ট (ঘুষ কত দিতে হবে) করে আস।

২. বখশিষ : পিয়নটাকে কিছু বখশিস (ঘুষ) দিয়ে দিন ফাইলটা বের করে দিবে।

৩. মাল পানি : বহু কাজ তো ফাও করায়ে নিলেন স্যার; এবার কিছু মালপানি (ঘুষ) ছাড়ুন।

৪. খরচ পাতিঃ অফিসে কিছু খরচ-পাতি (ঘুষ) দিয়ে যান বিলটা পাশ করিয়ে রাখবো।

৫. পার্সেন্টেজঃ স্যার আমার একটা বিল জমা দিয়ে টোকেন নিয়েছি। এই যে, আপনার টেবিলে এ বিল আজকে চেক পাবো তো স্যার! কত টাকার বিল আপনার? স্যার ৫ লক্ষ টাকার। আমাদের হিসাব জানা আছে

তো? জি না স্যার, হিসাব জানা না থাকলে চেক পেতে দেরী হবে। হিসাবটা স্যার ২% পারসেন্ট (ঘুষ) আমাদেরকে দিতে হবে। ঠিক আছে স্যার পাসেন্টজ দিবো তবুও আমার চেকটা দিয়ে দিন। ঠিক আছে বিলের সাথে নগদ ১০.০০০/= টাকা জমা দিয়ে যান আগামীকাল এগারাটায় চেক নিয়ে যাবেন, ওকে স্যার।

৬. মিষ্টি: বিচারে জিততে হলে ঘরে বসে চিন্তা করলে লাভ হবে না। মাদবর সাহেবের বাড়ীতে মিষ্টি (ঘুষ) দিয়ে আলাপ করে আসেন।

৭. সুদৃষ্টি: তিন বছর চাকরী করলাম। কিছুই করতে পারিনি। জনাব, শুধু ৫তলা একটি বাড়ী করেছি। এবার আপনাদের সুদৃষ্টি (ঘুষ) থাকলে একটি গাড়ি কিনবো ভাবছি।

৮. খোঁজ-খবর: স্যার ফাইলের জন্য কষ্ট করে আপনাকে ব্যাংকে আসতে হবে না। কাজ শেষ হলে আমিই আপনার বাসায় দিয়ে আসবো। আপনি শুধু আমার একুটু খোজ-খবর (ঘুষ) রাখবেন আর কি?

৯. সম্মানি: স্যার ফাইলগা কাইলগা জরুরী ছাড়ি দিয়েন। সম্মানির (ঘুষের) লাগি কোন চিন্তা করিয়েন না। আঁই আইয়্যা দিয়া দিমু।

১০. সেলাম: আরে হালা নবাবেরপুত গলির ভিতরে ট্রাক ঢুকাইয়া মাল ভরতাছস? তোর বাপের সেলাম করছস? শিগগির সেলাম (ঘুষ) কর ছময় কম।

১১. ক্লিয়ারন্স: এই ড্রাইভার ক্লিয়ারেন্স আছে? ক্লিয়ারেন্স আবার কি? আমার লাইসেন্স সবকিছুই তো আছে। বেটা, জানিস না এই রোডে গাড়ি চালাতে হলে আমদের কিয়ারেন্স দিতে (ঘুষ) হয়।

১২. ম্যানেজ : ইন্সপেক্টর সাহেবকে ম্যানেজ কর (ঘুষ)দেখবে তিনিই রিপোটটা তোমার সেভাবে দিবে।

১৩. পাওনা : স্যার প্রোট উততুন আজিয়া মাল ছোড়ার পড়িবো। ভালা কাষ্টমার পা গেইয়ি দয়া পার ফাইল গা তাড়াতাড়ি ছাড়ি দিন। বেশী কথ বলে অফিসের সময় নষ্ট করবেন না সাহেব। আগে আমাদের পাওনা (ঘুষ) বুঝিয়ে দিন সবই হয়ে যাবে।

১৪.সহযোগিতা : রাস্তার কাজটা যাতে আমি পাই সেই চেষ্টা করুন । সহযোগিতা (ঘুষ) যা লাগে দিব।

১৫. কমিশন : স্যার বিলটা কি পাবো? বিল পাবেন না কেন? তবে কমিশন (ঘুষ) কত দিবেন তা আগে ফাইনাল করে ফেলুন।

১৬.ডিসকাউন্ট : ব্যাংকের লোন কি এত তাড়াতাড়ি পাওয়া যায় সাহেব? কত পার্সেন্ট (ঘুষ) দিবেন তা আগে বলে ফেলুন।

১৭. নেক নজর : আপনাদের একটু নেক নজর (ঘুষ) পাই বলে চলতে পারছি, নতুবা এত কম বেতনে সংসার চলে?

১৮. চুক্তি : দোস্ত কি যে বিপদে পড়েছি বাসায় অতিরিক্ত কোন বিদ্যুৎ খরচ করি না, বিদেশে কোন ফোন করি না অথচ প্রতি মাসে কয়েক হাজার টাকা বিল আসে। শোন,অফিসে গিয়ে আসল জায়গায় চুক্তি করে(ঘুষ) আস, দেখবে সারা মাস আমরিকায় টেলিফোন কথা বললেও হাজার দেড়েক এর বেশী বিল আসবে না।

১৯.সন্তুষ্ট : বাড়ীর প্লানটা তাড়াতাড়ি পাশ করিয়ে দিলে আপনাকে অবশ্যই সন্তুষ্ট করব(ঘুষ দিব) স্যার।

২০. ডোনেশন : ভাই সাহেবে কি বলবো আর স্কুল কলেজে এখন সন্তানদের ভর্তি করানো বড়ই সমস্যা। ডোনেশন (ঘুষ) ছাড়া কিছুই হয় না।

২১.খুশি করা : স্যার চলে যাচ্ছেন? কাজটা করে দিলাম একটু খুশি করবেন না? (ঘুষ) দিবেন না।

২২.এক্সটা পারিশ্রমিক : স্যার ১মাস যাবত ফাইলটা আপনার টেবিলে পড়ে আছে। এবার বলুন আর কতবার আসতে হবে? দেখেন না ভাই হাতে কত কাজ, এক্সটা পারিশ্রমিক (ঘুষ) দিলে এখনই ছেড়ে দিবো।

২৩.তৈল : আরে ভাই অফিসে জায়াগ মত তৈল (ঘুষ) দিতে পারলে সব কাজ করানো যাবে।

২৪.বাড়তি আয় : গত এক মাস যাবত কোন বাড়তি আয় হচ্ছে না। (ঘুষ পাচ্ছে না) সংসার কিভাবে চলাবো চিন্তা করে কুল পাচ্ছি না।

২৫.মাশোহারা : স্যারকে কিছু মাশোহারা দিয়ে আসেন দেখবেন আজই কাজটি করে দিবে।

২৬.উপহার : স্যারের হোলার জন্মদিনে সামনে যে দামী উপহার (ঘুষ) দিছেন এখন আমনের ফাইল স্যারের আতে ধরা থাইকত না।

২৭.মিষ্টি মুখ : আপনার বহু কাম কইরা দিছি এবার মিষ্টি মুখ(ঘুষ) ছাড়া কোন কাম করতাম না।

২৮.টাকা পয়সা : স্যার আমার বদলির ব্যাপারে একটু দেখবেন। ঠিক আছে কিছু টাকা পয়সার (ঘুষ) ব্যবস্থা করুন সব ঠিক করে দিবো।

এছাড়া ঘুষ, বখরা, হাওলাত, টোকেন, টুপাইস ইত্যাদি শব্দের আড়ালে চলছে ঘুষে রমরমা ব্যবসা যা জাতির জন্য মোটেই মঙ্গলজনক নয়।

অথচ হযরত সাওবান রা. হতে বর্ণিত,

لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشى والمرتشى والرائش

অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সা. ঘুষদাতা, ঘুষগ্রহীতা এবং উভয়ের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপনকারী সকলের উপর অভিশাপ করেছেন। (মুসনাদে আহমাদ)

অন্য হাদীসে আছে, الراشى والمرتشى فى النار ঘুষদাতা ও গ্রহীতা উভয় জাহান্নামী

প্রিয় পাঠক! আবার বলছি, ঘুষ খাওয়া হারাম ও কবিরা গোনাহ। তাই আসুন নিজেও ঘুষ থেকে বাঁচি অন্যকেও বাচাঁই। আল্লাহ আমাদের সকলকে তৌফিক দান করুন। (আমিন)

বানরের ডাক্তারি শক্তি

ঘটনাটি ক্বারী তৈয়্যব সাহেব রাহ. বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, একবার আমি রাজপোতা অঞ্চলে সফরে গিয়েছিলাম। সেখানে আমার কতক বন্ধু চাকরী করতো। সেখানে বানরের উপদ্রব খুব বেশী ছিল। যেহেতু হিন্দুদের রাজত্ব ছিল আর তাদের কাছে বানর খুব মহৎ প্রাণী। তাই সরকারীভাবে বানর মারা নিষেধ ছিল। আমরা যেখানে থাকতাম ঐ জায়গাটা কিছুটা খোলা ছিল। এ সুযোগে বানর কখনো কাপড় নিয়ে যেতো আবার কখনো বরতন নিয়ে যেতো।

ওই কমবখত প্রাণী এতো ক্ষতিকারক ছিল যে, কাপড় নিয়ে ছুড়ে ফেলা দূরের কথা বরং চোখের সামনে দেখিয়ে দেখিয়ে কাপড় ছিড়তো। মনে হয় যেন কাউকে চড়াচ্ছে। সরকারীভাবে যেহেতু বানর মারা নিষেধ ছিল তাই আমরা চুপে চুপে দশ বিশটা বানর মেরে ফেলেছি। কিন্তু তাতে কি হবে? বানর তো হাজার হাজার। বিরক্ত হয়ে আমরা একদিন সিদ্ধান্ত নিলাম এমন এক তদরবীর করবো যাতে একসাথে একশ দেড়শ বানর মরে যায়। তাতে অন্যদের শিক্ষা হবে। আর আমাদেরও ক্ষতির পরিমাণটা কমে যাবে। তাই আমরা কিছু বিষ কিনলাম এবং উহা আটার সাথে মিলিয়ে রুটি তৈরী করলাম। এবং এক টুকরীতে ভরে ছাদের উপর ছড়িয়ে দিলাম। উদ্দেশ্য ছিল বানর রুটি খেলে বিষক্রিয়ায় মারা যাবে। কিন্তু বানর ভারী চালাক প্রাণী। কিছু বানর এসে রুটিগুলো ছড়ানো ছিটানো দেখে চিন্তা করতে লাগলো যে এত রুটি এভাবে ছড়ানো ছিটানো কেন? নিশ্চয় তাতে কোন রহস্য আছে।

তারা রুটিগুলো না খেয়ে বরং প্রতিটি বানর এক একটা রুটি উলট-পালট করে দেখতে লাগলো এবং একজন আরেকজনের দিকে তাকাচ্ছিল যেন তারা একজন আকেজনকে প্রশ্ন করছে রুটিগুলো এভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রইলো কেন? নিশ্চয় তাতে কিছু আছে। দুই, চার মিনিট পর তিন চারটা বানর চলে গেল।

তখন আমরা ভাবতে লাগলাম যে, আমাদের তদবীর বুঝে গছে। তারা গিয়ে তাদের গোত্রকে বিষয়টি অবহিত করলো। কিছুক্ষণ পর আমরা দেখলাম প্রায় এক দেড়শত বানরের বিশাল কাফেলা আসলো। তার মধ্যে গোত্রপতি মোটা বানরও ছিল, এসে রুটির চারপাশে গোল হয়ে বসে পড়ল। মনে হয় যেন গেল টেবিল কনফারেন্স হচ্ছে এবং চিন্তা করতে লাগলো রুটি এভাবে পড়ে রইল কেন? তাতে কি রহস্য আছে? একটি বানর আগে বাড়লো এবং রুটির টুকরাগুলোতে ঘ্রাণ নিতে লাগলো। আরেকজন আগে বাড়লো সেও একটি রুটির টুকরা হতে ঘ্রাণ নিলে চার পাঁচটি বানর এরূপ করলো। অত:পর তারা ইশারায় কি যেন বললো। সব বানর চলে গেল।

এখন আমাদের বিশ্বাস হয়ে গেল যে, আমাদের তদবীর ব্যর্থ হয়ে গেছে। বানরেরা তা বুঝে ফেলেছে। অতএব, রুটিগুলো উঠিয়ে নিব এবং

যেহেতু বিষ মিশ্রিত রুটিগুলো কোন কাজে আসবে না খাওয়াও যাবে না। এবং খাওয়ানো যাবে না তাই এইগুলো মাটিতে পুঁতে ফেলতে হবে; এভাবে প্রায় দশ মিনিট পার হয়ে গেল। কিছুক্ষণ পর আনুমানিক দুই আড়াইশ বানর আসলো এবং প্রত্যেকের হাতে পাতাসহ একটি করে ডাল রয়েছে। তারা এসে রুটিগুলো যতটা বানর ততটা টুকরা করলো। প্রত্যেক বানর এক এক টুকরা করে ভাগে পেল। অত:পর তারা সবাই এক একটি টুকরা খেয়ে সাথে সাথে একটি গাছের পাতা চিবাতে লাগলো। এভাবে সবগুলো রুটি শেষ করলো; অথচ একটা বানর মরলেও না এমনকি বেহুশও হলো না। যেন রুটিতে বিষের প্রভাব হয় নি। (খুতুবাতে হাকিমুল ইসলাম, খ.১, পৃ: ২২১)

আল্লামা ইবনে সা'নার ঘটনা

হযরত আলী রা. বলেন যে, হুজুর আকরাম রা.-এর নিকট জনৈক ইহুদীর কিছু ঋণ প্রাপ্য ছিল। সে এসে তার পাওনা চাইল। হুজুর সা. বললেন,এ মুহূর্তে আমার নিকট কিছুই নেই, আমাকে কিছু সময় দাও। ইহুদি কঠোরভাবে তাগাদা করে বলল, আমি আপনাকে ঋণ পরিশোধ না করা পর্যন্ত কিছুতেই ছাড়ব না। হুজুর সা. বললেন, তোমার সে অধিকার রয়েছে। আমি তোমার কাছে বসে পড়ব। তারপর হুজুর সা. সেখানেই নামায আদায় করলেন। এমনকি পরের দিন ফজরের যোহর, আছর, মাগরীব ও ইশার নামায ও সেখানেই পড়লেন। বিষয়টি দেখে সাহাবয়ে কেরাম রা. অত্যন্ত মর্মাহত হলেন এবং ক্রমাগত রাগান্বিত হচ্ছিলেন। আর ইহুদীকে আস্তে আস্তে ধমকাচ্ছিলেন যাতে সে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ছেড়ে দেয়। হুজুর সা. বিষয়টি বুঝতে পেরে সাহাবীগণকে বললেন, একি করছো? তখন তারা নিবেদন করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এটা আমরা কেমন করে সহ্য করব যে, একজন ইহুদী আপনাকে বন্দি করে রাখবে? হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আমার পরওয়ারদেগার কোন চুক্তিবদ্ধ ব্যক্তির প্রতি আমাকে জুলুম করতে বারণ করেছেন।

এ ইহুদী এসব ঘটনা লক্ষ্য করছিল। সকাল হওয়ার সাথে সাথে ইহুদী বলল,

اشهد ان لا اله الا الله واشهد انك رسول الله

অর্থাৎ, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি নিশ্চয় আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নাই এবং সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিঃ সন্দেহে আপনি আল্লাহর রাসূল ।

সে ইসলাম গ্রহণ করে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আমার অর্ধেক সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় দান করে দিলাম। আমি আল্লাহর নামে কসম করে বলছি এতক্ষণ আমি যা কিছু করেছি তার উদ্দেশ্য ছিল শুধু এই পরীক্ষা করা যে, তাওরাতে আপনার যে সবগুণ- বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হয়েছে তা আপনার মধ্যে যথার্থই বিদ্যমান আছে কি না? আমি আপনার সম্পর্কে তাওরাতে এই কথাগুলো পড়েছি যে, তাঁর নাম হবে মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ, তাঁর জন্ম হবে মক্কায়। তিনি হিজরত করবেন তাইবার দিকে। আর তাঁর দেশ হবে সিরিয়া। তিনি কঠোর মেজাযের হবেন না। কঠোর ভাষায় তিনি কথাও বলবেন না। হাটে বাজারে তিনি হট্টগোলও করবেন না। অশ্লীলতা ও নির্লজ্জতা থেকে তিনি দূরে থাকবেন। পরীক্ষা করে আমি উল্লিখিত বিষয়গুলো সঠিক পেয়েছি। কাজেই আমি সক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই, আর আপনি হলেন আল্লাহর রাসূল। আর এই হল আমার অর্ধেক সম্পদ।

আপনি যেভাবে খুশি খরচ করতে পারেন। সে ইহুদী অনেক ধন সম্পত্তির মালিক ছিল। তার অর্ধেক সম্পদও ছিল উল্লেখযোগ্য সম্পদ।

(মা'আরেফুল কুরআন, বাংলা পৃঃ ৪৮৭)

পাঁচ আঙ্গুলের ব্যাখ্যা

ঘটনাটি ইমাম মালেক রাহ.-এর। তিনি হলেন চার মাযহাবের এক মাযহাবের ইমাম। ইমাম মালেক রাহ. এর অবস্থা এমন ছিল যে, তিনি রাসূলের মোহাব্বতের কারণে মদিনা শরীফকে অত্যন্ত ভালবাসতেন এবং মদিনার মোহব্বতে বিভোর ছিলেন। মদিনার প্রতিটি বস্তু এমনকি বালুকণা ও ইমাম মালেক রাহ. এর নিকট অতিপ্রিয় ছিল। তাই তিনি মনে প্রাণে কামনা করতেন তার মৃত্যু ও দাফন যেন মদিনার মাটিতে হয়। মদিনার

বাহিরে তার ইন্তেকাল হয়ে যায় কিনা এ ভয়ে নফল হজ্জ পর্যন্ত আদায় করতেন না।

একদা রাতে তিনি স্বপ্ন দেখেন রাসূল সা. এক মজলিসে বসে আছেন ইমাম মালেক রাহ. তথায় উপস্থিত। তিনি খুব কাতর সূরে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ সা., আমার মনে চায় মদিনার মাটি যেন আমাকে কবুল করে নেয় এবং মদিনার বাহিরে ইন্তেকাল এবং দাফন হয়ে যায় কিনা এই ভয়ে আমি নফল হজ্জ ও আদায় করি না। হুজুর সা. আমাকে বলে দিন আমার বয়স কতদিন বাকী আছে, আমি যদি জানতে পারি যে, আমার হায়াত এখনো এত বছর বাকী আছে তাহলে আমি প্রতি বছর নফল হজ্জ আদায় করবো।

প্রতি উত্তরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইমাম মালেককে পাঁচ আঙ্গুল তুলে দেখালেন। এমন সময় ইমাম মালেক রাহ. এর ঘুম ভেঙ্গে গেল। জাগ্রত হয়ে ইমাম মালেক পেরেশান হলেন এই ভেবে যে, পাঁচ আঙ্গুল দ্বারা উদ্দেশ্য কি? পাঁচ মাস নাকি পাঁচ বছর, নাকি পাঁচ সপ্তাহ? তিনি ভেবে-চিন্তে কোন কুল পাচ্ছেন না।

তাই তিনি তার খাদেমকে পাঠালেন স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানার জন্য। এবং সাথে সাথে ইহাও বলে দিলেন যে, আমার নাম বলবে না, শুধু বলবে একজন মুসলমান এই স্বপ্ন দেখেছে।

খাদেম ইবনে সিরিনের খেদমতে হাজির হয়ে বললেন, হুজুর, একজন মুসলমান রাসূল সা. কে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞাসা করেছিল আমার বয়সের কত বাকী আছে? প্রতি উত্তরে হুজুর সা. তাকে পাঁচ আঙ্গুল তুলে দেখিয়েছেন। স্বপ্নদ্রষ্টা তার ব্যাখ্যা জানতে চেয়েছেন।

ইবনে সিরিন জিজ্ঞাসা করলো স্বপ্ন কে দেখেছে? খাদেম বললো, স্বপ্নদ্রষ্টার নাম বলতে নিষেধ করেছে। তৎক্ষণাৎ ইবনে সিরিন বললেন, এই স্বপ্ন বড় কোন আলেম দেখতে পারে। সাধারণ আলেমে এই স্বপ্ন দেখতে পারেন না। নিশ্চয়ই ইহা বড় কোন আলেমের স্বপ্ন হবে। আর মদিনাতে ইমাম মালেকের চেয়ে বড় কোন আলেম নেই। সুতরাং এই স্বপ্ন ইমাম মালেক দেখেনি তো? এই কথা বলতেই খাদেম চুপ হয়ে গেলো।

ইবনে সিরিন বললো, যাও তার থেকে নাম বলার অনুমতি নিয়ে আস। পরে তাবীর বলে (স্বপ্নের ব্যাখ্যা) দিবো। খাদেম গিয়ে বললো, হুজুর তিনি তো আপনাকে চেনে ফেলেছেন। এখন নাম প্রকাশ না করলে তিনি তাবীর বলবেন না। ইমাম সাহেব বললেন, যাও আমার নাম বলে দাও। খাদেম যখন ইবনে সিরিনের কাছে নাম বললো, সাথে সাথে ইবনে সিরিন বললেন, এই স্বপ্ন ইমাম মালেকই দেখতে পারে। এরূপ স্বপ্ন দেখা সাধারণ কোন আলেমের পক্ষে সম্ভব নয়। যাও ইমাম মালেককে বলে দাও, হুজুর সা. পাঁচ আঙ্গুল দ্বারা পাঁচ বছর বা বা দিন অথবা মাস কিংবা সপ্তাহ বুঝাননি বরং এই আয়াতের দিকে ইশারা করেছেন। যাতে বলা হয়েছে পাঁচটি বিষয়ের ইলম একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কারো জানা নাই আর মৃত্যুও ঐ পাঁচ জিনিসেরই অর্ন্তভুক্ত। যার ইলম আল্লাহ ছাড়া আর কারো জানা নেই।

পাঠক এবার শুনুন এ পাঁচটি জিনিস কি?

إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ

অর্থাৎ "নিশ্চয় আল্লাহর কাছে রয়েছে, ১. কিয়ামত দিবসের ইলম, ২. তিনি জানেন কখন বৃষ্টি বর্ষিত হবে। ৩. তিনিই জানেন মায়ের পেটে কি আছে। ৪. কোন মানুষ জানে না আগামীকাল সে কি কামাই (পাপ/পূণ্য) করবে এবং কোন মানুষ জানে না কোথায় মৃত্যুবরণ করবে।

(সূত্রঃ খুতুবাতে হাকিমুল ইসলাম, খ. ১,পৃ ৮৮)

চোগলখোরীর পরিণাম

একবার এক মালিক তার গোলামকে বাজারে বিক্রি করতে নিয়ে গেল। এক ক্রেতা এসে জিজ্ঞাসা করলো ভাই আপনার গোলামটি কেমন? লোকটি গোলামের অনেক গুণ বর্ণনা করলো। এক পর্যায়ে বললো, আমার গোলামের ৯৯টি গুণ আছে, একটি মাত্র দোষ আছে, তাহলো চোগলখুরী। ক্রেতা বেচারা ভাবলো যার এত গুণ একটি মাত্র দোষ নিশ্চয়ই এই গোলাম ভাল হবে, দোষ যেটা আছে আমরা চেষ্টা করলে হয়তো সেটাও থাকবে না।

যাহোক এই সবকিছু চিন্তা করে সে গোলাম কিনে নিল। গোলাম মালিকের বাড়িতে থাকতে থাকলো। একদিন তার মধ্যে চোগলখোরী করার বদ অভ্যাস মাথাচাড়া দিয়ে উঠলো। তাই সে চোগলখুরী করার সুযোগ তালাশ করতে লাগলো।

একদিন গোলাম দেখে যে, তার মালিক বাজারে এক মহিলার সাথে কথা বলছেন। গোলাম এ সুযোগে বাড়ীতে এসে মালিকের বউকে বলতে লাগলো, আপনি আপনার স্বামীর কোন খবর রাখেন? তিনি তো এক মেয়ের প্রেমে পড়েছে। যে কোন মুহূর্তে আপনাকে তালাক দিয়ে তাকে বিবাহ করে ফেলতে পারে। তাছাড়া আপনি কি ইদানিং লক্ষ্য করেননি যে, আপনার স্বামী আপনার সাথে কথাও কম বলছে।

বেচারী হতবাক হয়ে জিজ্ঞাস করলো ব্যাপারটি কি তাই, যা তুমি বলছো? গোলাম বললো, জি হ্যাঁ! ঘটনা আমি যা বলছি তাই। তখন বেচারী বললো, তাহলে আমি এই মূহুর্তে কি করতে পারি? প্রতি উত্তরে গেলাম বললো, চিন্তার কোন কারণ নাই। আমি কিছু তদবীর জানি একটা তদবীর করলেই আবার আপনার সম্পর্ক জোড়া লাগবে এবং মালিক ঐ মেয়েকে ভুলে যাবে। তবে এর জন্য আপনি একটি কাজ করতে হবে। সেটা কি কাজ? গোলাম বললো, মালিকের গলার নিচের কয়েকটা চুল লাগবে যা তদবীরের কাজে ব্যবহার করতে হবে। তখন বেচারী জিজ্ঞাসা করলো গলার চুল নিব কেমন করে? তখন গোলাম বললো, কেন এটাতো সহজ কাজ। আপনার স্বামী যখন ঘুমিয়ে থাকবে তখন আস্তে করে ছুরি দিয়ে গলার নিচ থেকে দুই একটা চুল কেটে নিবেন, তাতে মালিক টেরও পাবেন না। বেচারী তাতে রাজী হল।

এদিকে গোলাম বাজারে গিয়ে মালিককে বললো, আপনি কি বাড়ী ঘরের খবর রাখেন? মালিক বললো, বাড়ীতে আবার কি হয়েছে? এবার গোলাম কানে কানে বললো, আপনার স্ত্রী অন্য পুরুষের সঙ্গে প্রেম করে, সে সিদ্ধান্ত নিয়েছে আজকেই আপনাকে মেরে প্রেমিকের সাথে চলে যাবে। আমার কথা বিশ্বাস না করলে আজকে ঘুমের ভান করে দেখুন। আপনার স্ত্রী আপনার গলার নিচে ছুরি ধরে কি না? বেচারা গোলামের কথাটা পরীক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিলেন। সে রাত্রে ঘরে ঘুমের ভান করে শুয়ে রইলেন।

এ দিকে বেচারী সহজ সরল মনে গোলামের নির্দেশ মত স্বামীকে কাছে পাওয়ার আশায় চুল নেওয়ার জন্য যেই গলার নিচে ছুরি ধরে তৎক্ষনাৎ স্বামী স্ত্রীর হাত ধরে উত্তেজিত ও ক্ষিপ্ত হয়ে স্ত্রীর হাত থেকে ছুরি কেড়ে নিয়ে তাকে হত্যা করে ফেললো। ফলে ধ্বংস হলো দুইটি জীবন। শুরু হলো উভয় পরিবারের মধ্যে অঘোষিত লড়াই। পরবর্তিতে জানতে পারলো যে, এত বড় সর্বনাশ আর জঘন্য কাজ করেছে ঐ চোগলখোর গোলাম। তাই আমরা চোগলখোরী বর্জন করি।

রাসূল সা. বলেন, لايدخل الجنة قتات অর্থাৎ চোগলখোর জান্নাতে প্রবেশ করবে না।

পাঁচ কবরের ঘটনা

ঘটনাটি হযরত সুলতান আহমাদ নানুপুরি রহ. বর্ণনা করেছেন। একবার এক যুবক অত্যন্ত পেরেশান হয়ে খলিফা আব্দুল মালেকের দরবারে আসলো। খলিফা আব্দুল মালেক যুবককে পেরেশন দেখে এর কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। উত্তরে যুবক বললো, আমি আমার গোনাহের কারণে পেরেশানিতে আছি। খলিফা বললেন, তোমার গোনাহ কি আসমান-জমীন থেকে বড়? যুবক বললো হ্যাঁ। এবার খলিফা বললেন, তোমার গোনাহ কি আরশ থেকে বড়? যুবক বলল হ্যাঁ। এবার খলিফা বললেন, তোমার গোনাহ বড় নাকি আল্লাহর রহমত বড়? এবার যুবক নিশ্চুপ হয়ে মাথা নিচু করে বসে রইলো।

খলিফা আব্দুল মালেক বললেন, বলতো,তুমি কি গুনাহ করেছো? যুবক বললো, আমি একজন কাফন চোর ছিলাম। পাঁচটি কবরের মুর্দা আমাকে তওবার করার জন্য সতর্ক করেছে। কবরগুলোর অবস্থা ছিল এমন যা বর্ণনাতিত। তারপরও আপনার নিকট ঘটনাগুলো বর্ণনা করছি।

১. আমি যখন প্রথম কবর খনন করলাম তখন দেখলাম মুর্দাকে কেবলার দিক থেকে অন্য মুখী করে দেওয়া হয়েছে এবং তাকে কঠিন শাস্তি দেওয়া হচ্ছে। এই ভয়ানক দৃশ্য দেখে আমি সেখান থেকে দৌড়ে ফিরে আসলাম। হঠাৎ এক ফেরেশতা গায়েব থেকে আওয়াজ দিলো তুমি এই মুর্দাকে কেন

জিজ্ঞাসা করলে না যে তার এই শাস্তি কেন হচ্ছে? আমি উত্তরে বললাম, এ কথা আমি জিজ্ঞাসা করতে পারবো না। তখন ফেরেশাত বললেন, ঐ ব্যক্তি নামায নিয়ে উপহাস করতো। এই জন্য তার এই শাস্তি হচ্ছে।

২. তারপর আমি দ্বিতীয় কবর খনন করলাম, দেখলাম ঐ কবরের মুর্দা একেবারে শুকরের ন্যায় হয়ে আছে। গলায় ফাঁস এবং পায়ে বেড়ী দ্বারা পেচানো। এই লোমর্হষক দৃশ্য দেখে আমি দৌড়ে চলে এলাম। গায়েব থেকে এক ফেরেশতা আওয়াজ দিলো তুমি মুর্দাকে এই আযাবের কারণ জিজ্ঞাসা করলে না কেন? আমি উত্তরে বললাম, আমার জিজ্ঞাসা করার ক্ষমতা নেই। তখন ফেরেশতা বললেন, এই লোকটি মদপানকারী। আল্লাহর তায়ালা যা হারাম করেছে উহাকে সে হারাম মনে করতো না।

৩. আমি যখন তৃতীয় কবরটি খনন করলাম তখন তার মুর্দাকে আগুনের পেরেখে বাঁধা অবস্থায় দেখতে পেলাম। তার জিহ্বা গাধার ন্যায় বের হয়েছিল আমি ভয়ে সেখান থেকে চলে এলাম। পূর্বের মত এক্ষেত্রেও গায়েব থেকে এক ফেরেশতা আওয়াজ দিলে মুর্দাকে শাস্তির কারণ জিজ্ঞাসা করলে না কেন? উত্তরে বললাম, আমার ক্ষমতা নাই। তখন ফেরেশতা বললেন, এই লোক অন্যের সম্পদ ধ্বংস করার চেষ্টা করতো। এই জন্য তার এই শাস্তি হচ্ছে।

৪. আমি যখন ৪র্থ কবরটি খনন করলাম তখন দেখলাম এ কবরে আগুন জ্বলছে। আর ফেরেশতা তাকে মারছে, সে চিৎকার করছে, আমি ভয়ে ফিরে এলাম। এবারও গায়েব থেকে আওয়াজ আসলো এই শাস্তির কথা কেন জিজ্ঞাসা করলে না? আমি আগেই মতই বললাম যে, আমার এই ক্ষমতা নাই। তখন ফেরেশতা বলেন, এই লোকটি মিথ্যাবাদি ছিলো এবং মিথ্যা কসম খেত, এই জন্য তার এই শাস্তি হচ্ছে।

৫. এরপর ৫ম কবরটি খনন করলাম। তাতে মুর্দাকে আগুনের পিলার দ্বারা পিটাচ্ছে। এই অবস্থা দেখে আমি সেখান থেকে ভয়ে চলে এলাম। আগের মতই গায়েব থেকে আওয়াজ আসলো তুমি তাকে শাস্তির কারণ জিজ্ঞাসা করলে না কেন? আমি বললাম, আমার এই ক্ষমতা নাই। তখন ফেরেশতা বললেন, এই লোকটি জুয়াড়ী ছিল। সব সময় জুয়া খেলতো। তাই তার এই শাস্তি হচ্ছে। (সুত্রঃ মায়ারেফুস সুলতান, খণ্ড-১০ পৃষ্ঠা-৪৪-৪৫)

প্রিয় পাঠক, এই ঘটনা থেকে আমাদের অনেক কিছু শিক্ষণীয় আছে। যে সমস্ত অপরাধের কারণে কবরে শাস্তি হচ্ছে সে সমস্ত অপরাধ আমরা সর্বদা করছি।

অতএব, আমাদের তাওবা করা উচিত। নতুবা আমরাও কবরের উক্ত আজাবে গ্রেফতার হয়ে যাবো। তখন আমাদের সাহায্য করার কেউ থাকবে না। আল্লাহ আমাদের সকলকে গোনাহ থেকে বাঁচার তৌফিক দিন। (আমিন)

আপনার হাত মধুর পাত্রে আমার হাত পায়খানার পাত্রে

একবার এক মুরিদ তার পীরের কাছে গিয়ে বলল, হুজুর গতরাতে আমি স্বপ্ন দেখেছি, আপনার হাতটি একটি মধুর পাত্রে ডুবানো রয়েছে, আর আমার হাত একটি পায়খানা ভর্তি পাত্রে ডুবানো আছে। এতটুকু বলতে না বলতেই পীর সাহেব আনন্দের অতিশয্যে স্থির থাকতে না পেরে বলে উঠলো,হবে না কেন? এমনই তো হবে! তুই যে গুনাহগার। দুনিয়ার কুকুর। তাই তোর হাত নাপাক পাত্রে ডুবানো থাকবে। আমি যে বুযুর্গ, আল্লাহর ওলী তাই আমার হাত মধুর পাত্রে ডুবানো থাকে। তৎক্ষণাৎ মুরীদ বলে উঠলো,হুজুর আমার স্বপ্ন এখনো শেষ হয়নি। তারপর দেখি আমার হাতের আঙ্গুল আপনি চাটছেন, আর আপনার হাতের আঙ্গুল আমি চাটছি। এই কথা শুনে পীর সাহেব ক্ষিপ্ত হয়ে মুরীদকে যা ইচ্ছা তাই বলে গালাগালি করতে লাগলো।

এই হলো জাহেল পীরদের অবস্থা। যাদের না আছে কোরআনের এলেম, না আছে হাদীসের এলেম। এমন কি পীর হওয়ার জন্য কি কি শর্ত থাকা দরকার তাও জানেন না। শুধু দুনিয়ার স্বার্থে মুরিদ করে থাকে। আর বেচারা মুরিদরা সহজ করল মন নিয়ে আল্লাহকে পাওয়ার জন্য মুরিদ হয়ে থাকে। পরবর্তিতে তারা গোমরাহ হয়ে যায়। এমন অনেক জাহেল পীরের কথা শুনেছি যারা নবীর সুন্নত দাঁড়ী পর্যন্ত রাখে না, রাখলেও কেটে ছেটে দাঁড়ীর অবস্থা বারটা বাজিয়ে রাখে। আর সূরা কেরাতের অবস্থা হলো, এমন যে, সুরা ফাতিহার পড়লে মনে হয় কোন মন্ত্র পড়ছে, যা ভুলে ভরা।

অতএব, যাদের নিজেদেরই হেদায়েত নেই সে আরেকজনকে কি করে হেদায়েত করবে?

পাঠক! একজন মুরুব্বীর থেকে একটি ঘটনা শুনেছি, একবার এক লোক সদরঘাট নেমছে যাবে চকবাজার। সে হেঁটে হেঁটে ইমামগঞ্জ পর্যন্ত এসেছে। ইমামগঞ্জ থেকে চকবাজার মাত্র দুই তিন মিনিটের পথ। লোকটি যেহেতু চকবাজার চেনে না তাই সে দোকানের সামনে দাঁড়ানো এক লোককে জিজ্ঞাসা করল ভাই, চকবাজার যাবো কিভাবে? লোকটি তাকে সদরঘাটের রাস্তা দেখিয়ে বলল, এই রাস্তা দিয়ে চকবাজার যাওয়া যায়। বেচারা আবার উল্টা পথে হাঁটতে লাগলো। দোকানের ভিতরের এক লোক তার কথায় সন্দেহ করলো। তাই সে দোকান থেকে বের হয়ে জিজ্ঞাসা করলো ও মিয়া, ঐ লোকটি আপনার কাছে কি জানতে চেয়েছে? সে বললো, চকবাজার যাওয়ার পথ জানতে চেয়েছে। আপনি কি বলেছেন? সে বললো? আমি ঐ পথ দেখিয়েছি। দোকানের লোকটি বললো, আপনি কি চকবাজার চেনেন? সে বলল, না। তাহলে আপনি উল্টা পথ দেখিয়ে দিলেন কেন? দোকানের লোকটি তার উপর ভীষণ রাগান্বিত হয়ে উঠল। অত:পর লোকটাকে ডেকে সঠিক পথ দেখিয়ে দিলেন।

প্রিয় পাঠক! জাহলে পীর ঐ লোকটির মতই যে নিজেই হেদায়েতের পথ চেনে না সে অন্যকে পথ দেখাবে কি করে? তাই আসুন, হক্কানী পীর চেনার জন্য উহার শর্তগুলো জেনে নেই।

১. আলেম হতে হবে। আলেমের সংজ্ঞা হলো; কমপক্ষে তিনটি কিতাব এমনভাবে শিক্ষা করতে হবে যেন তার সুন্দরভাবে ছাত্রদেরকে পড়াতে পারেন এবং ছাত্ররা তার পড়ানোর যোগ্যতার পক্ষে স্বাক্ষ্য দিবে। কিতাব তিনটি হলো। ক, তাফসীরে জালালাইন খ. মেশকাত শরীফ গ. হেদায়া উভয় খণ্ড।

২. প্রত্যেক ফরজ ওয়াজিব এবং সুন্নাতের পুরাপুরি পাবন্দ হতে হবে এবং হারাম ও মাকরূহ কাজসমূহ সম্পূর্ণভাবে বর্জন করতে হবে।

৩. মানুষকে শিক্ষা দানের জন্য অপর একজন হক্কানী পীর কর্তৃক অনুমতি প্রাপ্তি হতে হবে, যার পর্যায়ক্রমিক পীরের প্রথম পীর স্বয়ং

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক অনুমতি প্রাপ্ত হয়েছেন। যেমন, ধরুন এদেশের একজন বড় ওলী ছিলেন হাফিজ্জী হুজুর রাহ., হযরতের পীর ছিলেন, হযরত আশরাফ আলী থানবী রাহ., তাঁর পীর ছিলেন, হযরত ইমদাদুল্লাহ মোহাজেরে মক্কী রহ., তাঁর পীর ছিলেন মিয়াজী নূর মোহাম্মাদ জানজুবী রাহ., তাঁর পীর ছিলেন শাহ আব্দুর রহীম রহ., তাঁর পীর ছিলেন শাহ্ আ. বারী রহ., তার পীর ছিলেন আব্দুল হাদী রহ., তাঁর পীর ছিলেন শাহ আযদুদ্দীন রহ., তাঁর পীর ছিলেন শাহ মক্কী রহ., তাঁর পীর ছিলেন শাহ আবু সাঈদ রহ., তাঁর পীর ছিলেন নিযামুদ্দীন বলখী রাহ., তাঁর পীর ছিলেন শায়েখ জালালুদ্দীন থানেশ্বরী রহ., তাঁর পীর ছিলেন শাহ আব্দুর কুদ্দুস রাহ.,তাঁর পীর ছিলেন শায়েখ মুহাম্মদ আরিফ রাহ., তাঁর পীর ছিলেন শায়েখ আরিফ বিন আহমদ রহ., তাঁর পীর ছিলেন আব্দুল হক্ব রহ., তাঁর পীর ছিলেন শায়খ জালালুদ্দিন রুমী রাহ., তাঁর পীর ছিলেন শায়খ সামসুদ্দিন তিবরিজী রাহ., তাঁর পীর ছিলেন শায়খ আলাউদ্দীন সাবের কালারী রহ., তাঁর পীর ছিলেন রিদুদ্দিন শকরগঞ্জী রহ., তাঁর পীর ছিলেন খাজা মাঈনুদ্দিন চিশতি রাহ., তাঁর পীর ছিলেন খাজা উসমান হারুনী রহ., তাঁর পীর ছিলেন মওদুদ চিশতী রহ., তাঁর পীর ছিলেন আবু ইউসুফ রাহ., তাঁর পীর ছিলেন আবু মোহাম্মাদ রাহ., তাঁর পীর ছিলেন আহমাদ আদাল রহ., তাঁর পীর ছিলেন খাজা ইসহাক শামী রাহ., তাঁর পীর ছিলেন খাজা মুমশাদ রহ., তাঁর পীর ছিলেন আবু হুবাইরা রাহ., তাঁর পীর ছিলেন খাজা হুজাইফা রাহ., তাঁর পীর ছিলেন খাজা ইব্রাহিম ইবনে আদহাম রাহ., তাঁর পীর ছিলেন খাজা আব্দুল ওয়াহিদ রাহ., তাঁর পীর ছিলেন হাসান বসরী রহ., তাঁর পীর ছিলেন আমিরুল মোমেনীন হযরত আলী রা., তাঁর শাইখ হলেন খাতামুন নাবিয়্যীন রাসূলে মাকবুল সা.।

ইহা হলো পীরের সনদ। হক্কানী পীর হতে হলে অবশ্যই তার সনদ লাগবে। আর সেই পীরের দরবারে আলেমগণ যান কি না দেখতে হবে। কারণ হক্কানী পীরের সান্নিধ্যে থেকে এছলাহ লাভের জন্য সাধনা করতে হয়। এই জন্য আলেমগণও হক্কানী পীরের দ্বারা উপকৃত হন। হক্কানী পীরের মুরীদের কাছ থেকে টাকা পয়সা বা দুনিয়ার কোন সুযোগ সুবিদা নেওয়ার ইচ্ছা থাকে না।

তিনি ইচ্ছাকৃত কোন কারামত প্রকাশ করেন না। এমন কি যদি অনিচ্ছাকৃত তার থেকে কোন কারামত প্রকাশ পেয়ে যায় তবে তিনি মনে কষ্ট পান। তার মজলিসে বসলে অন্তরে আল্লাহর ভয় জাগে, পরকালের কথা মনে পড়ে, অন্তর শান্তিতে ভরে উঠে। আল্লাহ আমাদেরকে হক বুঝার তৌফিক দান করুন। তথ্যগুলো যাচাই করার জন্য দেখতে পারেন- যিয়াউল কুলুব এবং কছদুস সাবীল গ্রন্থ।

উস্তাদজীর কান্না

বর্তমানে উন্নতির মানে হলো একজনের উন্নতি এবং তার কারণে দশ জনের অবনতি। এ ব্যাপারে একটি ঘটনা রয়েছে। এক মুন্সি এক ব্যক্তির বাড়ীতে বাচ্চাদের পড়াতেন। বাড়ীওয়ালা বিদেশে গিয়ে ভালো এক চাকরী পেল। বেতনও অনেক টাকা এই সুসংবাদ জানিয়ে সে বাড়ীতে চিঠি লিখলো

বাড়িতে কেউ চিঠি পড়তে জানতো না। চিঠি পড়ে শোনানোর জন্য তারা উস্তাদজীর কাছে নিয়ে গেল। উস্তাদজী চিঠি পড়ে কাঁদতে লাগলেন। বাড়ীর সবাই উস্তাদজীকে কাঁদার কারণ জিজ্ঞাসা করল। তিনি বললেন, তোমরাও কাঁদ। উস্তাদজীর কথা শুনে বাড়ীর সবাই কাঁদতে লাগলো। কান্নার আওয়াজ শুনে পাড়ার সবাই ছুটে আসল। জিজ্ঞাসা করল কান্নার কারণ কি? মোল্লাজী বললেন, তোমরাও কাঁদো। পাড়ার লোকেরাও হাউ মাউ করে কাঁদতে লাগলো । সারা মহল্লা কান্নার আওয়াজে ভারী হয়ে উঠলো।

যখন সবাই কাঁদতে কাঁদতে ক্লান্ত হল এবং ধীরে ধীরে কান্নার আওয়াজ স্থিমিত হয়ে আসলো, তখন সবাই মোল্লাজীকে জিজ্ঞাসা করলো হুজুর, এই কান্নার কারণ কি? উস্তাদজী বললেন, বাড়ীওয়ালার বিদেশ থেকে চিঠি এসেছে। তিনি বড় চাকুরী পেয়েছেন এবং তার বেতনও অনেক টাকা। লোকেরা বলল, এটাতো আনন্দের কথা। কান্নার কোন কারণ তো দেখি না উস্তাদজী! উস্তাদজী বললেন, তোমরা বুঝতে পারছো না। যখন এত টাকা বেতন হয়েছে তখন ছেলে মেয়েদেরকে আর আরবী পড়াবে না। বাড়ীতে মাষ্টার রাখবে। আমার চাকরী যাবে তাই আমার কান্না। বাড়ীওয়ালীর স্থানে নতুন যুবতী বউ ঘরে আসবে, সংসার ভাঙ্গবে তাই বাড়ীওয়ালীর কান্না।

মহল্লায় এসে যখন তিনি বসবাস শুরু করবে তখন তার আরবী ঘোড়া এবং মোটরগাড়ী রাখার জন্য পাড়ার লোকদেরকে উচ্ছেদ করা হবে। কারণ তার বাড়ীটি বিরাট হবে। আর পাড়ার লোক হবে ভিটা ছাড়া এবং বাস্তহারা। সুতরাং পাড়ার সবাই না কেঁদে পারে না। (হাঃ মালফুযাতে থানভী)

হেরে গেলো নাস্তিক

পাঠক ঘটনাটি পড়ার আগে জেনে নেই নাস্তিক কাকে বলে, যে আল্লাহর অস্তিত্বকে বিশ্বাস করে না তাকে নাস্তিক বলা হয়।

এবার মূল ঘটনা শুনুন : এক নাস্তিক এই বলে চ্যালেঞ্জ করলো যে আল্লাহর কোন অস্তিত্ব নাই। এক বুযুর্গ তার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে বিতর্কের জন্য একটি তারিখ নির্ধারণ করল। উক্ত তারিখে হাজার হাজার উৎসুক জনতা এই বির্তক অনুষ্ঠান দেখার জন্য সমবেত হল। যা বিশাল জনসমাবেশে পরিণত হল। নাস্তিকও যথাসময় সমাবেশে উপস্থিত হলো। কিন্তু বুযুর্গ আসতে অনেক দেরী করলো। নাস্তিক তখন বললো, এত দেরী কেন? আপনি ওয়াদা ভঙ্গ করেছেন। জবাবে তিনি দেরী করে আসার কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে বললেন, আমার আসার পথে একটি নদী ছিল। নদী পারাপারের কোন উপায় ছিল না। অনেক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলাম। হঠাৎ দেখলাম আমার সামনেই একটি বৃক্ষ জন্মিল এবং অল্প সময়েই বড় হল। অত:পর করাত চলে আসলো। গাছটি কেটে তখতা বানানো হল। অত:পর পেরেক, হাতুড়ী ইত্যাদি এল। তারপর তৈরী হল নৌকা। নৌকাটি আমার সামনে চলে এলো এবং সে নৌকা দিয়েই আমি পার হয়ে এলাম। তাই দেরী হয়েছে।

নাস্তিক এ কথা শুনে চিৎকার করে বলে উঠলো, হুজুর! আপনি কি পাগল হয়ে গেলেন। এতগুলো কাজ কিভাবে নিজে নিজে হয়ে গেল?

এবার বুযুর্গ বললেন, এটাই হচ্ছে আপনার বির্তকের উত্তর। যখন আপনিই বলেছেন, এতগুলো কাজ নিজে নিজে হতে পারে না তাহলে আপনি কিভাবে চিন্তা করলেন যে, এই বিশাল সৃষ্টি জগতে গ্রহ, নক্ষত্র, আকাশ, আলো বাতাস, গাছ-পালা, মানুষ, পশু-পাখি, নদী-নালা, সাগর-মহাসাগর,

পাহাড়-পর্বত, অসংখ্য জীবজন্তু এসব কিছু নিজে নিজেই তৈরী হয়েছে ? এর পিছনে একজন শক্তিশালী সুনিপুন কারিগর অবশ্যই আছেন আর তিনিই হচ্ছেন সর্ব শক্তিমান আল্লাহ। এ জগতের সৃষ্টিকর্তা ও তার একমাত্র মালিক তিনিই যিনি মহান আল্লাহ।

বুযূর্গের কথা শুনে একেবারে নাস্তিক চুপ। কোন উত্তর দিতে পারল না। পরাজয়ের গ্লানী নিয়ে মজলিস ত্যাগ করলো। উত্তাল জনতা বিজয়ের বেশে বাড়ীতে ফিরে গেল। আর সকলের মুখে একই কথা হেরে গেল নাস্তিক।

প্রিয় পাঠক! আপনার খুবই ইচ্ছে হচ্ছে ঐ বুযুর্গের নাম জানতে তাই না? তাহলে শুনুন, তিনি আর কেউ নন-তিনি হলেন ৫৫বার হজ্জ আদায়কারী, ৪০ বছর পর্যন্ত এশার অজু দিয়ে ফজরের নামাজ আদায়কারী, আমার আপনার ইমাম, ইমামে আজম আবু হানিফা রাহ.।

প্রিয় পাঠক! আমরা সব যুগেই হক ও বাতিলের এই দ্বন্দ্ব দেখতে পাই। ইতিহাস অধ্যয়ন করলে একথা সুস্পষ্ট হয়ে উঠে যে, হক বাতিলের সংঘাত আজকের নতুন কিছুই নয় বরং আদিকাল তথা আদম আ. থেকে নিয়ে রাসূল আকরাম সা. এর যুগ পর্যন্ত। এমনিভাবে হুজুর সা. থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত সব যুগেই চলছে হক বাতিলের প্রতিদন্দ্বিতা। হক যখন দুনিয়াতে অসহায় অবস্থায় আসে তখনই বাতিল বৃহৎ শক্তি, হুংকার ও গর্জন নিয়ে প্রকাশিত হয়। যদিও হক সহায় সম্বলহীন অবস্থায় এসেছে তবুও আল্লাহ পাক সদা সর্বাদা হককেই বাতলে উপর বিজয় দান করেছেন।

প্রিয় পাঠক! হক-বাতিলের দ্বন্দ্ব বুঝার জন্য আপনার বিবেককে ১৪০০ বছর এবং তার পূর্বের ইতিহাসের দিকে ঘুরিয়ে নিন। তাহলে আনায়াসেই বুঝতে পারবেন যে,বাতিল যখন নমরুদের রূপ ধারণ করে এসেছিল হক তখন ইব্রাহীম আ. এর আকারে এসেছিল। আল্লাহ তায়ালা ইব্রাহীম আ. কে বিজয়ী করেছেন।

বাতিল যখন ফেরআউনের খোদয়ী দাবী নিয়ে হাজির হলো, হক তখন নবী মূসা আ. হয়ে তার মোকাবেলা করলো। আল্লাহ তায়ালা নবী মুসা আ. কে বিজয়ী করেছেন।

বাতিল যখন বনী ইসরাইলের রক্ত পিপাসু হয়ে এসেছিল, হক তখন প্রকাশ পেয়েছিল হযরত ঈসা আ. আকার ধারণ করে। বিজয় ঈসা আ. এর পক্ষে ছিল।

বাতিল যখন রোম সম্রাট ও পারস্য সম্রাটের পরাশক্তি নিয়ে হাজির হলো, হক তখন সরদারে দোআলম তাজেদারে মদীনা হযরত রাসূলে মাকবুল সা. এর রূপ ধারণ করে, আল্লাহ তাঁর প্রিয় হাবিবকে বিজয়ী করেছেন এবং হককে পুরা পৃথিবীতে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন।

প্রিয় পাঠক! পরর্বতী যুগের দিকে তাকালে একই চিত্র ফুটে উঠবে। বাতিল যখন হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের সুরতে বাহির হলো, হক তখন আব্দুল্লাহ ইবনে যোবাইরের সুরত ধারণ করলো। আর বাতিল যখন খলিফা মানছুরের রূপ ধারণ করলো, হক তখন হাজির হলো ইমাম আবু হানিফার পোশাক পরিধান করে।

বাতিল যখন মুতাসিম বিল্লার রূপ ধারণ করলো, হক তখন ইমাম আহমদ বিন হাম্বলের সুরতে প্রকাশিত হলো। বাতিল যখন আসল শাহ আল জুতীর আকারে, হক তখন আসলো ইমাম গাযযালীর সুরতে। বাতিল যখন তাতারীর সুরতে হাজির হলো, হক তখন আল্লামা ইবনে তাইমিয়ার লেবাস পরিধান করলো। বাতিল যখন জালালুদ্দিন আকবরের সুরতে আসলো, হক তখন মোজাদ্দাদে আলফে সানীর রহ. পোশাকে হাজির হলো, বাতিল যখন ইসনা আশারিয়া গ্রুপের সুরতে আসলো, হক তখন শাহ শাহ ওয়ালি উল্লাহ রাহ. এর আকর ধারণ করলো। বাতিল যখন রাজা রনজিত সিংএর আকার ধারণ করলো, হক তখন শাহ ইসমাইলের রূপ ধারণ করলো। বাতিল যখন আগমন করলো ইংরেজদের আকারে, হক তখন আসলো শাহ আব্দুল আজিজের সুরতে। বাতিল যখন আসলো ধর্ম বিধ্বংসী বহুরূপী বেশ নিয়ে, হক তখন আসলো উলামায়ে দেওবন্দের লেবাস পরিধান করে।

হক বাতিলের সংঘাত এভাবেই যুগ যুগ ধরে চলে আসছে। আর আল্লাহ তায়ালা হককেই জয়ী করেছেন। আজও পৃথিবীতে নাস্তিক, মুরতাদ, কাদিয়ানী, এনজিও, ইয়াহুদী ও নাছারাদের সৃষ্ট বহু রূপ বাতিল চলছে।

ইনশাআল্লাহ! হককেই আল্লাহ তায়ালা তাঁর ওয়াদা বিজয় করবেন। তবে এর জন্য আমাদেরকে মেহনত করতে হবে। অবশেষে একটি আয়তের দ্বারা শেষ করছি,

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ

অর্থ: আর তোমরা নিরাশ হয়ো না এবং দু:খ করো না, যদি তোমরা মুমিনও হও, তবে তোমরাই জয়ী হবে।

হযরত উমর রা. এর চিঠি নীলনদীর বরাবর

ঘটনাটি হযরত উমর রা. এর খেলাফতের যুগের। তখন মিশরের গর্ভনর ছিলেন হযরত আমর ইবনুল আস। তৎকালীন মিশরবাসীদের আয়ের বড় উৎস ছিল কৃষি। তাই নীলনদের পানি দিয়েই ক্ষেত খামারে সেচ দিত। আমর ইবনুল আস যখন সমস্ত মিশর বিজয় করলেন তখন কোন একবার নীলনদের পানি শুকিয়ে গেল। নদীতে জোয়ার আসা বন্ধ হয়ে গেল। পানির অভাবে ফসল নষ্ট হতে লাগলো। এমনকি কিছু লোক হতাশ হয়ে দেশ ত্যাগ করার প্রস্তুতি নিয়ে নিলো। এই অবস্থা দেখে মিশরবাসীরা তৎকালীন মিশরের গভর্ণর আমর ইবনুল আস এর নিকট এসে বলল, পূর্বে যখন এমন করে নদী শুকিয়ে যেতো, তখন আমরা এক সুন্দরী কুমারীকে অলংকারাদি ও সুন্দর বস্ত্রাদি দ্বারা সাজিয়ে নদীতে উৎসর্গ করে দিতাম। সাথে সাথে নদী পানিতে ভরে যেতো। গভর্ণর বললেন, এ ধরণের কাজ ইসলাম অনুমোদন করে না। আইয়ামে জাহিলীয়াতের সব প্রথা ইসলাম বিলুপ্ত করে দিয়েছে। আমি খলিফাকে জানাচ্ছি, তিনি এর সমাধান বলে দিবেন।

হযরত আমর ইবনুল আস রা. বিস্তারিত ঘটনা খলিফাতুল মুসলিমিন উমর রা. এর নিকট লিখে পাঠালেন। হযরত উমর রা. বিস্তারিত ঘটনা জানার পর নীল নদের বরাবরে একটি পত্র লিখলেন। যার বিবরণ এইরূপ।

بسم الله الرحمان الرحيم

من عمر بن الخطاب الى نيل مصر ان كنت تجرى بامر الله فاجر على اسم الله تعالى وان كنت تجرى لنفسك فلا حاجة لنا بك

অর্থাৎ উমর ইবনে খাত্তাবের পক্ষ থেকে নীলনদের বরাবর। 'হে নীল নদ! তুমি যদি আল্লাহর হুকুমে প্রবাহিত হয়ে থাক তাহলে পত্র পাওয়া মাত্রই পুনরায় আল্লাহর হুকুমে প্রবাহিত হও। আর যদি অন্য কারো আদেশে প্রবাহিত হও, তবে তোমার পানি আমাদের কোন প্রয়োজন নাই।'

এই চিঠি দেখে ইসলামের দুশমনেরা বিদ্রুপ করতে লাগলো। তারা বলল, দেখ, নদীর উপরও আল্লাহর হুকুম চালাচ্ছে। কিন্তু আল্লাহ ওয়ালাগণ যা বলেন বুঝে শুনেই বলেন। নদী হুকুম না মানলে ইজ্জত বিনষ্ট হবে এমন কোন ধারণাও করেন নি হযরত উমর রা.।

হযরত আমর ইবনুল আস রা. হযরত উমর রা. এর চিঠি নিয়ে নীলনদের দিকে রওয়ানা হলেন। বিধর্মীরাও তাঁর সাথেই ছিল। তারা হাসাহাসি করে বলতে লাগলো, আচ্ছা, বলতো দেখি এই চিঠির সাথে নীলনদের জোয়ারের কি সম্পর্ক থাকতে পারে? কিন্তু এই চিঠি নদীতে ফেলার সাথে সাথে জোয়ার এসে দু'কূল ভরে নদী প্রবাহিত হতে লাগলো। আজও নীলনদীর ঢেউ আঁছড়ে পড়েছে দু কূলে। তাঁর জোয়ার প্রবাহিত হয়ে চলছে অবিরাম। উমরের চিঠির মাধ্যম সূচনা হলো নতুন দিগন্তের। কুমারীকে বলি দেওয়ার প্রথা চিরতরে বিলুপ্ত হলো।

ইহা ছিল উমরের ঈমানী শক্তি। যার কারণে নীলনদ তার পত্র পাওয়া মাত্রই প্রবাহিত হয়েছিলো। যুগ যুগ ধরে মুসলমানদের সফলতা ঈমানী শক্তির বদৌলতে এসেছিল। আজ মুসলমান ঈমানী শক্তিতে দুর্বল হওয়ার কারণেই সব জায়গাতেই নির্যাতীত, নিপীড়িত লাঞ্চিত পদ-দলিত হচ্ছে।

তাই আসুন, আমরা ঈমানী শক্তি অর্জন করি।তাহলে দেখবেন আমাদের কথাও সকলে শুনবে ইনশাল্লাহ। (সুত্র : নুজহাতুল মাজালিস পৃ: ১৫৯)

নবীর স্বপ্ন

আবু লাইস সমরকান্দীর পিতা বর্ণনা করেন, কোন এক নবী স্বপ্নে জনৈক ব্যক্তিকে একথা বলতে শুনেছেন যে, আগামীকাল সকালে ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার পরে সর্বপ্রথম আপনি যে জিনিসের সম্মুখীন হবেন তা খেয়ে নিবেন। দ্বিতীয় যে জিনিসের সম্মুখীন হবেন তা গোপন করে রাখবেন।

তৃতীয় বস্তুকে আপনার আশ্রয়ে নিয়ে নিবেন। চর্তুথ জিনিসকে নিরাশ করবেন না। পঞ্চম বস্তু থেকে পলায়ন করে দূরে সরে যাবেন।

পরদিন সকালের কথা। প্রথম তিনি একটা বিরাট কালো পাহাড় দেখতে পান। অত্যন্ত হতাশ ও পেরেশান হলেন। হায়! এই বিশাল পাহাড় আমি খাব কিভাবে? কিন্তু যখন খাবার ইচ্ছা করলেন সাথে সাথেই পুরা পাহাড় হালুয়ার মত লোকমা হয়ে মুখে এসে গেল। একটু সামনে অগ্রসর হয়ে তিনি স্বর্ণের একটা সুন্দর সিংহাসন দেখতে পান। হুকুম মত তিনি তা মাটিতে পুতে রাখলেন। সাথে সাথে তা মাটির উপরে উঠে এল। এমনিভাবে তিনি কয়েকবার মাটিতে পুতে রাখলেন। কিন্তু বারবার তা উপরে উঠে এল। ফলে বাধ্য হয়ে উহাকে ঐ অবস্থায় ফেলে চললেন। অত:পর সামনে কিছুদূর অগ্রসর হয়ে দেখতে পান একটা ফুটফুটে সুন্দর পাখি চিৎকার করে বলছে, ওগো পেয়ারা নবী, আমাকে দয়া করে সাহায্য করুন। তিনি ঐ পাখিটাকে স্বীয় জামার আস্তীনের মধ্যে আশ্রয় দিয়ে হেফাজত করলেন।.

অত:পর পাখিটি বিনয়ের সাথে খাবার চাইলে নবী তার রানের গোস্ত কেটে টুকরো টুকরো করে পাখিটিকে খেতে দিলেন। তারপর তিনি আরো একটু সামান্য অগ্রসর হযে রাস্তায় পতিত অবস্থায় একটা মৃত জানোয়ার দেখতে পান। স্বপ্নের আদেশ মত তিনি খুব দ্রুত বেগে ঐ স্থান অতিক্রম করে গেলেন।

পরে ঐ নবী আ. মহান আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করলেন ওগো মাওলা, আমার এই স্বপ্নের ব্যাখ্যা কি? সঙ্গে সঙ্গে ওহীর মাধ্যম জানিয়ে দেওয়া হলো যে, ঐ বিশাল কালো পাহাড় তা হল গোস্বা। যা প্রথমে পাথর ছিল পরে মধুতে রূপান্তরিত হয়েছে। আর স্বর্ণের সিংহাসন হলো মানুষের নেকী। মানুষ তা যতই গোপন করতে চেষ্টা করুক না তা প্রকাশ পাবেই।

আর পাখির দ্বারা উদ্দেশ্য হলো মজলুম তথা নির্যাতিত লোক। যাদেরকে সাহায্য করতে এবং আশ্রয় দিতে বলা হয়েছে। আর যারা তোমাদের আমানতদার মনে করবে তাদের খিয়ানত করবে না। আর মুর্দার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো গীবত। তা থেকে বেঁচে থাকা উচিত। (গোল দাশতা ২২৭)

প্রিয় পাঠক! কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ এই ঘটনাতে রয়েছে। প্রথমত গোস্বাকে সংবরণ করা। কারণ গোস্বা একটি খারাপ স্বভাব যা মানুষকে প্রতিশোধী করে তোলে। যার ফলে মানুষ মনুষত্ব হারিয়ে ফেলে। তাইতো একবার সাহাবী বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আমাকে খুব সংক্ষেপে এমন একটি নসিহত করুন যা আমি মুখস্ত করতে পারি। উত্তরে রাসূল সা. বললেন, لاتغضب রাগ করো না। সাহাবী বারবার প্রশ্ন করতে ছিলেন প্রতিবারে রাসূল সা. বললেন, لاتغضب রাগ করো না।

প্রিয় পাঠক ! চিন্তা করুন রাগ কত খারাপ স্বভাব।

দ্বিতীয় উপদেশ ছিল নেকীকে গোপন রাখা। যদি আল্লাহ প্রকাশ করে দেন তাহলে তাতে মঙ্গল ছাড়া আর কিছুই নাই। কিন্তু নিজের পক্ষ থেকে প্রকাশ করার মন মানসিকতা না থাকা। আজ তো আমদের অবস্থা এমন যে, ছোট খাটো কোন নেকীর কাজ করলেও তা মানুষকে জানানোর জন্য বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করি।

৩য় উপদেশ ছিল মাজলুমকে আশ্রয় ও তার সাহায্য করা। আজ তো চর্তুদিকে মজলুমের কান্নার আওয়াজে বাতাস ভারি। কারো পিতা হারানো বেদনা,কারো স্বামী হারানো বেদনা, কারো সন্তান হারানো বেদনা, কিন্তু তারপরেও সাহায্য করা তো দূরের কথা তাদের জন্য দোয়া করাও যেন কঠিন হয়ে পড়েছে। গীবত তো মহামারী রূপ ধারণ করেছে। ছোট থেকে বড়, দশতলা থেকে গাছতলা সর্বত্রই চলছে গীবত। কোন মজলিসে গীবত না হলে মনে হয় যেন মজলিসটা জমেই না। অথচ গীবত করা হারাম এবং কবিরা গোনাহ। আল্লাহ ও রাসূল সা. ইরশাদ করেন, যে গীবত করলো সে মৃত ভাইয়ের গোস্ত ভক্ষণ করলো। তাই আসুন আমরা গীবত পরিহার করি।

চোখ জ্বলে যায়

বর্তমানে আমাদের একটি বড় রোগ হলো, কেউ কোন ইবাদত করলে তা মানুষকে জানানোর জন্য বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করি। এমন একটি কৌশলের নাম হলো, 'চোখ জ্বলে যায়'। ঘটনাটি আমি একজন বিজ্ঞ আলেম থেকে শুনেছি।

এক লোক তাহাজ্জুদ নামায পড়তো। তাহাজ্জুদ পড়তো লোকে জানার কথা নয়। কারণ তাহাজ্জুদ হলো রাত্রিকালীন ইবাদত। আর তখন মানুষ নিজ নিজ ঘরে ঘুমে বিভোর থাকে। কিন্তু লোকটি মনে প্রাণে চাচ্ছে আমি যে তাহাজ্জুদ পড়ি তা লোকে জানুক, তাহলে তারা আমাকে তাহাজ্জুদ গোজার বলবে। তাহাজ্জুদের সুবাদে আমাকে সম্মান করবে। কিন্তু জানাবো কি করে? সরাসরি যদি বলি আমি তাহজ্জুদ পড়ি তাহলে তা ভাল শোনা যায় না। তাই সে একটা কৌশল অবলম্বন করলো। যেখানে দুই তিনজন মানুষ জড়ো হয় সেখানে গিয়ে তাদের সাথে খোশ গল্প করতে থাকে আর ফাঁকে ফাঁকে চোখ জ্বলে যায় একথা বলে চোখ ঢলতে থাকে। ফলে লোকেরা জিজ্ঞাসা করতো আপনার চোখ জ্বলে কেন? কি হয়েছে? উত্তরে সে বলতো, না তেমন কিছু হয় নাই তবে রাত্রে তাহাজ্জুদ পড়ার কারণে ঘুমাতে পারি নাই তো; যার কারণে চোখ জ্বলছে। এভাবে সে, মহল্লায় তার তাহাজ্জুদ পড়ার কথাটা পৌঁছিয়ে দিলো

ইবাদত যদি মানুষকে দেখানোর জন্য করা হয়, যে, মানুষ আমাকে নামাযি বলবে, তাহাজ্জুদ গোজার বলবে, হাজী সাহেব বলবে তাহলে তা শিরকের অর্ন্তভুক্ত হয়ে যাবে। তার কোন সাওয়াব সে পাবে না। বরং কঠিন শাস্তির সম্মুখিন হতে হবে।

আল্লাহর বরাবর চিঠি

একবার বাদশাহ হারুন রশিদের পুলিশ বাহিনী কয়েকজন ডাকাত গ্রেপ্তার করেছিল। ঘটনাক্রমে একজন ডাকাত ছুটে পালিয়ে গেল। যেহেতু ডাকাতদের সংখ্যার পরিমাণ সরকারী খাতায় লিপিবদ্ধ হয়ে গিয়েছে তাই পুলিশ বাহিনী নিজেদের বাঁচানোর জন্য অন্যায়ভাবে রাস্তা থেকে একজন গরীব, অসহায় ও নির্দোষ ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে সংখা পূরণ করলো। বাদশাহের নির্দেশে ঐ ডাকাতদেরকে হাজতে প্রেরণ করা হলো।

এই সংবাদ ডাকাতদের আত্মীয় স্বজনরা অবগত হওয়ার পর ডাকাতদেরকে মুক্ত করে নিয়ে গেল। এখন শুধু বন্দি রইল নিরাপরাধ এবং নির্দোষ গরীব পথিক। সে একটা চিঠি লিখে দারোগা সাহেবকে বললো, এ

কাগজের টুকরো মেহরেবানী করে ছাদের উপর থেকে বাতাসে উড়িয়ে দিবেন। যার মধ্যে লিখা ছিল, অধম গুনাহগারও নালায়েক বান্দার পক্ষ থেকে মহা সম্মানিত প্রভুর নিকট আবেদন। যাদের ব্যাপারে সুপারিশ করা হয়েছে তারা তো মুক্তি পেয়ে চলে গেছে, কিন্তু আমি অসহায়! আমার তো কোন বন্ধু-বান্ধব বা পরিচিত কেউ নাই। ওগো প্রভু, তুমি ব্যতিত আমার আর কোন সুপারিশকারী নাই। কাজেই আমার মুক্তির ব্যবস্থা করে দাও। ঐ রাত্রেই বাদশাহ হারুন রশিদ স্বপ্নে দেখেন যে, তাকে এ হুকুম করা হচ্ছে যে, ঐ অসহায় মজলুমকে মুক্তি দিয়ে দাও। স্বপ্নে নির্দেশ পেয়ে সকালেই ঐ মজলুম বন্দীকে দশ হাজার দিরহাম, দশ প্রকারের রাজকীয় উন্নতমানের পোষাক এবং দশটা ঘোড়া দিয়ে মুক্ত করে দিলেন। এবং ঘোষণা করে দিলেন যে, যারা আল্লাহর উপর ভরসা করে তাদের প্রতিদান এমনই হওয়া উচিত। (সূত্রঃ খাইরুল মাওয়ানিস)

তাওয়াক্কুল বিরাট নেয়ামত। যে আল্লাহর উপর তায়াক্কুল করবে আল্লাহ তার জন্য যতেষ্ট হয়ে যাবেন। অথচ আজ আমরা আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল ছেড়ে দিয়ে মাখলুকের উপর তাওয়াক্কুল করে বসে আছি। যার কারণে আজ শত শত সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে।

তাই আসুন তাওয়াক্কুল সম্পর্কে একটি গুরুত্বপূর্ণ হাদিস শুনি। হাদিসটি আমি শুনেছি মাওলানা তারিক জামিল দা:বা: এর থেকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

مَنْ تَوَكَّلَ على مَالِه فقد قل ومن توكل على سلطانه فقد ذل ومن توكل على علمه فقد ضل ومن توكل على عقله فقد احتل ومن توكل على الله فلا قل ولا ذل ولا ضل ولا اختل

অর্থঃ যে তার সম্পদের উপর তাওয়াক্কুল করবে তাতে তার সম্পদ কমে যাবে। যে তার বাদশাহীর উপর তাওয়াক্কুল করবে তাতে সে লাঞ্ছিত হবে। যে তার ইলমের উপর তাওয়াক্কুল করবে তাতে তার বুদ্ধি লোপ পাবে। আর যে আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করবে তার সম্পদ কমবে না, সে অপদস্ত হবে না, পথভ্রষ্ট হবে না এবং বিবেকও লোপ পাবে না।

যে আপনাকে আসতে দেয় না সে আমাকে যেতে দেয় না।

এক এলাকায় এক লাখপতি ছিল। তার এক কর্মচারী ছিল। কিন্তু সে লাখপতি এক ওয়াক্ত নামাজও পড়তো না। নামায কি জিনিস তাও জানতো না। কিন্তু তার কর্মচারী ছিল পাক্কা নামাজি। সে শুধু ফরজ নামাজই নয় বরং সুন্নাতও পড়তো। এমনকি দৈনিক ৫০ রাকাত নফল নামাজ পড়েও ক্ষান্ত হতো না। একারণে মালিক তাকে প্রায় বকাঝকা করতো। যখনই দেখি তখনই নামাজ, নামাজ, নামাজ। নামাজ ছাড়া সে কিছুই বুঝে না।

একদিন মালিক তাকে সঙ্গে নিয়ে বাজারে গেল কিছু পন্য সামগ্রী আনার জন্য। পথে মাগরিবের আযান হল। কর্মচারী বললো, সাহেব, আমি মসজিদে যাচ্ছি নামাজ পড়ার জন্য। মালিক চিৎকার করে বলতে লাগলো, আরে কমবখত! যখনই দেখি নামাজ! নামাজ! নামাজ! নামাজ ছাড়া কি তোমার আর কোন কাজ নেই? ঠিক আছে যা। তবে তাড়াতাড়ী পড়ে চলে আসিছ। এই বলে মালিক মসজিদের বাহিরে দাঁড়িয়ে রইল। আর কর্মচারী মসজিদে প্রবেশ করল। জামাতের সাথে নামাজ পড়লো।

ফরজ শেষ হলে সে সুন্নত পড়তে লাগল। মালিক বেচারা রাগে ক্ষোভে ফেটে উঠলো যেহেতু বাজারের সময় চলে যাচ্ছে। সুন্নাত শেষ করে সে আওয়াবিনের নিয়ত বাঁধলো। এখন মালিকের রাগ আরো বেড়ে গেল। সে মনে মনে বলতে লাগলো কমবখতের খবরও নাই। খোদাই জানে কতক্ষণ পর্যন্ত নফল পড়তে থাকে।

সে দুই রাকাতে শেষ করে তারপর আরো দুই রাকাতের নিয়ত বাঁধার ইচ্ছা করলো তখন মালিক চিৎকার করে বলতে লাগলো, আরে কমবখত! আসো না কেন? জবাবে কর্মচারী বললো, তিনি আমাকে আসতে দেয় না। এই বলে সে আবার নিয়ত বাঁধলো এবং খুব বিনয়ের সাথে আরো দুই রাকাত নামাজ পড়লো। পাঁচ-দশ মিনিট পর ছালাম ফেরালো।

আবার সে নিয়ত বাঁধার জন্য দাঁড়াতে লাগলো এবার মালিক রাগান্বিত হয়ে বলতে লাগলো, আরে নাদান! আসো না কেন? জবাবে সে বললো, আমাকে আসতে দেয় না। একথা বলে আবার নিয়ত বাঁধলো একদিকে

মালিক রাগে ফেটে উঠলো। যখন সে ছয় রাকাত পুরা করে পুনরায় নামাজের জন্য দাঁড়াতে লাগলো। মালিক বলতে লাগলো, আসছো না কেন? প্রতি উত্তরে সে বললো, আমাকে আসতে দেয় না। এবার মালিক জিজ্ঞাসা করলো তোমাকে কে আসতে দেয় না? জবাবে সে বললো, যিনি আপনাকে ভিতরে আসতে দেয় না তিনি আমাকে বাহিরে যেতে দেয় না। আপনাকে ওখানে আটকিয়ে রেখেছে আমাকে এখানে আটকিয়ে রেখেছে।

(সূত্রঃ খুতুবাতে হাকীমুল ইসলাম, খ ২,পৃঃ ২৪৩-২৪৪)

অর্থাৎ যে আল্লাহ আপনাকে মসজিদে আসতে দেয় না সে আল্লাহ আমাকে মসজিদ থেকে বের হতে দেয় না।

পাঠক! বাস্তবেও তাই আল্লাহ পাক যাকে ভালবাসেন তাকেই আল্লাহর হুকুম পালন করার তৌফিক দান করেন। আল্লাহর তৌফিক ছাড়া কোন নেক আমল করা কারো পক্ষে সম্ভব নয়।

হেরে গেলেন নানা জিতে গেলেন নাতী

প্রিয় পাঠক! শিরোনাম দেখে হয়তো চিন্তায় পড়ে গেলেন যে ঘটনাটি কি? তাহলে শুনুন,

হযরত হুসাইন রা. তখন ছোট ছিলেন। একদিন প্রিয় নবী সা. আদরের ছোট দুলাল, প্রিয় নাতী হযরত হুসাইন রা. কে নিয়ে খেলা করছিলেন। একবার হুজুর সা. সোহাগ করে হযরত হুসাইন রা. কে জিজ্ঞাসা করলেন বলতো কে বড়? তুমি না আমি? তৎক্ষণাৎ হুসাইন রা. বললেন, নানাজী আমি আপনার থেকে বড়। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আশ্চর্য কথা, তুমি আমার থেকে বড় কিভাবে? হুসাইন রা. বললেন, নানা বলুন তো আপনার পিতার নাম কি? হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আমার পিতার নাম আব্দুল্লাহ। হুসাইন রা. বললেন, আব্দুল্লাহ। এতটুকু নাম, এ পর্যন্তই শেষ। আর আমার আব্বাকে বলা হয় আসাদুল্লাহিল গালিব অর্থাৎ সকল কাফেরদের বিরুদ্ধে বিজয়ী বা আল্লাহর সিংহ। আমার আব্বার মত আব্বা কি আপনি পেয়েছেন? হুজুর সা. আশ্চর্য হলেন যে, এতটুকু বাচ্চা বলে কি?

হুসাইন রা. বললেন, নানাজী এবার বলুন তো আপনার মায়ের নাম কি? হুজুর সা. বললেন, আমেনা। হুসাইন রা. বললেন, এই আমেনা পর্যন্ত শেষ? কতজনে আপনার মাকে চেনে? আর আমর মা হচ্ছেন জান্নাতের সমস্ত নারীদের সরদার। আমার মা 'ফাতেমাতুজ্জাহরা। আমার মায়ের মত মা কি আপনি পেয়েছেন? আমার মায়ের মত মা কি আপনার আছে? হুজুর সা, তাঁর প্রিয় নাতীর কথা শুনে আশ্চর্যন্বিত হয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইলেন।

হুসাইন রা. বললেন, নানাজী আরো বলবো কি? প্রতি উত্তরে হুজুর সা. বললেন হ্যাঁ! হ্যাঁ! বল। হুসাইন রা. বললেন, এবার বলুন তো নানাজী আপনার নানার নাম কি ছিল? হুজুর সা. বললেন, আমার নানার নাম আব্দুল ওয়াহ্হাব। হুসাইন রা. বললেন, ওয়াহ্হাব নামের ব্যাক্তিকে কতজনে চেনে? আপনি কি আমার নানার মত নানা পেয়েছেন? আমার নানার মত নানা কি আপনার আছে? আমার নানা কে আপনি জানেন? আমার নানাকে পৃথিবীর সবাই জানেন। আমার নানার নাম হচ্ছে 'সাইয়্যেদুল মুরসালীন' বিশ্ব নবী জনাবে মুহাম্মাদ সা.। হুজুর সা. হুসাইন রা. এর বুদ্ধিতে মুগ্ধ হয়ে আদর করতে লাগলেন এবং বললেন, নাতী আজ তোমার কাছে হেরে গেলাম।

তর্ক যুদ্ধের বিজয়ী সম্রাট

ঘটনাটি শোনার আগে একটি মাসআলাহ জেনে নেই। তাহল ইমামের পিছনে মুক্তাদীর ক্বেরাত পড়ার বিষয়ে ইমামদের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে।

ইমাম আবু হানীফা রাহ. নিকট ইমামের পিছনে মুক্তাদী ক্বেরাত পড়া জায়েয নাই। কারণ ইমামের ক্বেরাতই মুক্তাদীর জন্য যথেষ্ট। অন্য মাজহাবে পড়ার অনুমতি রয়েছে।

যাহোক এবার মূল ঘটনাটি শুনুন, একবার মদিনার কিছু লোক ইমাম আবু হানিফার খেদমতে হাজির হলো। ইমাম সাহেব তাদের আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করলে তারা বললো,আমরা আপনার সাথে ইমামের পিছনে

ক্বেরাত পড়া সংক্রান্ত মাসআলার ব্যাপারে বির্তক করতে এসেছি। ইমাম সাহেব বললেন, আপনারা সকলে একসাথে কিভাবে আমার সাথে বিতর্কে অংশ নিবেন? একজন হলে তার কথা শুনে জবাব দিতে পারতাম। সবাই একসাথে বললে কার কথা শুনবো আর কথার জবাব দিবো?

মাশা'আল্লাহ! আপনারা সবাই আলেম। আপনাদের মধ্যে বড় আলেম যিনি তাঁকে নির্দিষ্ট করে দিন। তাঁর সাথে আমার আলোচনা হোক। এ প্রস্তাব অনুযায়ী তাঁরা একজনকে নির্দিষ্ট করে দিল এবং বললো, তিনিই আমাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় আলেম। তিনিই আপনার সাথে ইমামের পিছনে ক্বেরাত সংক্রান্ত মাসআলাহ নিয়ে আলোচনা করবেন। ইমাম সাহেব বললেন, তার উপর যদি আপনাদের এতই ভরসা থাকে তাহলে তাঁর পরাজয়ে কি আপনার নিজেদের পরাজয় বলে মেনে নিবেন? তাঁরা এক বাক্যে বললো, হ্যাঁ। ইমাম সাহেব বললেন, ব্যস তাহলে বির্তক খতম হয়ে গেছে এবং ফয়সালা হয়ে গেছে।

এজন্য আমরা নামাজের মধ্যে ইমাম নির্দিষ্ট করি সেই সকলের পক্ষ থেকে আল্লাহর সাথে কথা বলে। কেননা হাদীসে ইরশাদ হয়েছে, যার ইমাম আছে তার জন্য ইমামের ক্বেরাতই যথেষ্ট । (উকুদূজ জিমান, ২৮০পৃ.)

এরূপ ইমাম আবু হানিফার বহু হেকমতপূর্ণ জবাব বিভিন্ন কিতাবাদীতে মনি মুক্তার মত ছড়িয়ে আছে। যা পড়ে প্রতিপক্ষরা পর্যন্ত হতবাক হয়ে যায়। কিন্তু আফসোসের বিষয় আমাদের দেশের কিছু নব পন্ডিত এবং ধর্ম সম্পর্কে মূর্খ ও জাহেলরা ইমাম আবু হানিফা সম্পর্কে এমন অশালীন মন্তব্য করে যা শুনে খুব কষ্ট অনুভব হয়। উল্টো তাদের জন্য আফসোস হয়। যে ইমাম সাহেবের সমালোচনা করে তারা নিজের পায়ে নিজেই কুড়াল মারছে। কারণ এর পরিণতি তারা মৃত্যুর আগেই ভোগ করবে তাতে কোন সন্দেহ নাই। কারণ ওলামায়ে কেরামের সাথে বেয়াদবীর পরিণাম কখনো শুভ হয় না। তবে আল্লাহ পাক যদি হিদায়াত নসিব করেন তাহলে ভিন্ন কথা। তাই আমি ইমাম সাহেবের সমালোচকদেরকে বলবো, আগে ইমাম সাহেবের পূর্ণাঙ্গ জীবনী নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে পড়ে নিন। তারপর তাঁর ব্যাপারে কথা বলুন।

খোদায়ী ফায়সালা

প্রিয় পাঠক! আপনি ভাল করেই জানেন যে, হযরত হাসান ও হুসাইন রা. হযরত ফাতেমা রা.এর কলিজার টুকরা ছিলেন। তিনি উভয়কেই সমানভাবে ভালবাসতেন। এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরও নয়নমনি ছিলেন। রাসূল সা. ও তাদেরকে গভীরভাবে ভালবাসতেন, কখনো কখনো বুকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেতেন।

তাদেরই একটি ঘটনা : একদিন হযরত হাসান ও হুসাইন রা. কিছু লেখা লিখে আম্মাজান ফতেমা রা. এর কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলো আম্মা, বলুন তো আমাদের দুইজনের মধ্যে কার লেখাটি সবচেয়ে সুন্দর হয়েছে?

ফাতেমা রা. চিন্তায় পড়ে গেলেন। কারণ তিনি তো উভয়কেই অন্তর থেকে ভালবাসেন। কার লেখা সুন্দর বলে কাকে কষ্ট দিবেন। যদি বলেন হাসানের লেখা সুন্দর তাহলে হুসাইন কষ্ট পাবেন। আর যদি বলি হুসাইনের লেখা সুন্দর তখন হাসান রা. কষ্ট পাবেন। তাই তিনি প্রশ্নের জবাব না দিয়ে বললেন, যাও তোমাদের নানাকে জিজ্ঞাসা করো।

উভয়ে হাত ধরাধরী করে নানার কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলো আচ্ছা নানা, বলুন তো আমাদের উভয়ের মধ্যে কার লেখা সবচেয়ে বেশী সুন্দর? হুজুর সা. প্রশ্ন শুনে চিন্তিত হয়ে পড়লেন। কারণ তিনি যে, উভয়কে সমান ভালবাসেন। কার লেখা সুন্দর বলে কাকে কষ্ট দিবেন। তাই কোন উত্তরে খুঁজে পাচ্ছিলেন না। ইতোমধ্যে আল্লাহপাক জিব্রাইল আ. কে একটি আপেল দিয়ে বললেন, যাও এই আপেলটি রাসূল সা. এর হাতে দিয়ে বলবেন, আপনি হাসানও হুসাইনের লেখা একসঙ্গে রেখে আপেলটি উপর থেকে ছেড়ে দিবেন যার লেখার উপর আপেলটি পড়বে তার লেখা সুন্দর বলে বিবেচিত হবে। আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী জিব্রাইল আ. আপেলটি রাসূল সা. এর হাতে দিয়ে বললেন, আল্লাহ পাক বলেছেন আপনি হাসান ও হুসাইন এর লেখা একসঙ্গে রেখে আপেলটি উপর থেকে ছেড়ে দিবেন। আপেলটি যার লেখার উপর পড়বে তার লেখা সুন্দর বলে বিবেচিত হবে। যেমন কথা তেমন কাজ।

সাথে সাথে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নাতীদ্বয়কে ডেকে বললেন, তোমরা আমার সামনে লেখাগুলো রাখ। আমি উপর থেকে আপেলটি ছেড়ে দিবো। যাঁর লেখার উপর আপেলটি পড়বে তাঁর লেখা সুন্দর বলে বিবেচিত হবে। নানার কথা শুনে উভয়ই আগ্রহের সাথে লেখাগুলো নানার সামনে রাখলেন। আশেপাশের সবাই গভীর আগ্রহের সাথে দেখতে লাগলেন হাসান ও হুসাইনের প্রতিযোগিতা।

এবার হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উপর থেকে আপেলটি ছেড়ে দিলেন। ছাড়ার সাথে সাথেই আপেলটি দুই টুকরা হয়ে দুই ভাইয়ে লেখার উপর গিয়ে পড়লো। মূহুর্তে সকলের মন আনন্দে ভরে উঠল এবং ফায়সালা হয়ে গেল উভয়ের লেখা সুন্দর।

তিন তরিকার এক তরিকা

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারককে আমরা প্রায় সকলেই চেনি। তিনি ছিলেন হযরত ইমাম আবু হানিফার খাছ শাগরিদ। ইমাম বোখারীর খাছ উস্তাদ ও প্রখ্যাত মুহাদ্দিস। কোন এক সময় হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক এক ধনাঢ্য মালিকের বাগানের 'মালি' ছিলেন। তথায় তিনি বার বছর কাজ করেছিলেন। একদিন মালিক বাগানে এসে হযরত মুবারককে বললো, আমাকে একটি মিষ্টি ফল এনে দাও। তিনি একটি ফল এনে দিলেন। মালিক খেয়ে দেখেন ফলটি টক। তাই তিনি আবার বললেন, আমাকে একটি সবচেয়ে মিষ্টি ফল এনে দাও। তিনি আরো একটি ফল এনে দিলেন। মালিক খেয়ে দেখেন এটাও টক। মালিক আবারো বললেন, আমাকে একটি সবচেয়ে মিষ্টি ফল এনে দাও। এবারো একটি ফল এনে দিলেন। দেখা গেল এই ফলটিও টক।

পরপর তিনটি ফল টক হওয়াতে মালিক কিছুটা ধমকের সুরে বললো, আজ বার বছর তুমি আমার বাগানে কাজ করছো তুমি জান না কোন ফলটি মিষ্টি কোন ফলটি টক? তখন নিচের দিকে তাকিয়ে হযরত মুবারক রাহ. বললেন, সম্মানিত মালিক! আমি বার বছরে আপনার বাগানের একটি ফলও খেয়ে দেখিনি। অতএব, আমি কি করে বলবো কোন ফলটি মিষ্টি আর

কোন ফলটি টক? হযরত মুবারকের এই উত্তর শুনে মালিক রীতিমত হতবাক হয়ে গেল। এবং মনে মনে ভাবতে লাগল হযরত মুবারক সাধারণ কোন মানুষ নয় বরং সে আল্লাহর ওলী। কিছুক্ষণ চিন্তা করার পর মালিক মনে মনে খুব লজ্জিত হলেন এবং বলতে লাগলেন, আমি যদি তার মত হতে পারতাম কতই না ভাল হতো।

একদিন মালিককে খুব চিন্তিত দেখা যাচ্ছিল। মালিককে চিন্তিত দেখে জিজ্ঞাসা করলো আপনি কি কোন বিষয়ে চিন্তা করছেন? মালিক বললো, হ্যাঁ আমি একটি বিষয়ে খুব চিন্তিত। মনে মনে ভাবছি এই বিষয়ে তোমার সাথে পরামর্শ করবো। তুমিই আমাকে সঠিক পরামর্শ দিতে পারবে। বিষয়টি হলো আমার মেয়েটি বিবাহের উপযুক্ত হয়েছে। তাকে কোথায় বিবাহ দিবো। আমি কিছুই ভেবে পাচ্ছি না। মুবারক রাহ. বললেন, মালিক তাতে চিন্তার কোন কারণ নেই। আপনি তিন তরিকার যে কোন একটি তরিকা গ্রহণ করতে পারেন। ১. একটি হলো সৌন্দর্য দেখে বিবাহ দেওয়া যা ইয়াহুদীর তরিকা। ২. অগাধ ধন সম্পদ দেখে বিবাহ দেওয়া যা নাসারাদের তরিকা। ৩. দ্বীনদারী দেখে বিবাহ দেওয়া যা মুসলমানদের তরিকা।

এখন আপনি ভেবে দেখুন কোন তরিকা গ্রহণ করবেন। মালিক বাড়িতে গিয়ে বিবি ও অন্যান্য সদস্যদের সাথে আলোচনা করে সিদ্বান্ত নিলো মেয়েকে মুসলিম তরিকায় দ্বীনদার পাত্রের কাছে বিবাহ দিবেন। কিন্তু মালিকের চোখে মুবারকের চেয়েও বড় দ্বীনদার আর কে হতে পারে। তাই তিনি মুবারককে তার মেয়ে বিবাহ করার প্রস্তাব দিলেন এবং মেয়েও এই প্রস্তাবে রাজী তাও জানিয়ে দিলেন। অনেক পিড়াপীড়ির পর হযরত মুবারক রাজী হলেন এবং বিবাহ সম্পন্ন হয়ে গেল। সেই ঘরেই জন্ম নিলেন মুহাদ্দিস হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক রাহ.।

একবার তিনি বাগদাদে তাশরীফ আনলেন। হাজার হাজার ছাত্র হাদিস পড়ার জন্য হযরতের চারপাশে একত্রিত হল। হযরত হাদিস পড়াতে শুরু করলেন। সবকের মাঝে হযরত হাঁচি দিলে হাজার হাজার ছাত্র হাঁচির উত্তরে "ইয়ারহামুকাল্লাহ" বলে উঠলো। এ আওয়াজ বহুদূরে অবস্থিত বাদশাহ হারুনের প্রাসাদে গিয়ে বজ্রের ন্যায় আঘাত হানল। তাতে বাদশাহ ঘাবড়ে

গেলো। এবং ভাবতে লাগলো হয়তো আমার বিরুদ্ধে রাস্তায় কোন আন্দোলন হচ্ছো তাই তিনি বিষয়টি তদন্ত করার জন্য কিছু ফৌজ পাঠালেন। ফৌজ তদন্ত শেষ করে বাদশাহকে বললেন, আপনার ভয় পাওয়ার কিছুই নেই। মূল ঘটনা হলো, বাগাদাদে আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক নামে এক বিখ্যাত মুহাদ্দিস হাজার হাজার ছাত্রের সামনে দরস দিচ্ছেন। সবকের মাঝে হযরত হাঁচি দিয়েছিলেন, হাজার হাজার ছাত্র হাঁছির জবাবে সম্মস্বরে "ইয়ারহামুকাল্লাহ" বলেছিল। সেটার আওয়াজে আপনার প্রাসাদে এসে লেগেছে। তদন্ত রিপোর্ট শুনে তিনি হতবাক হয়ে যান এবং ঐ ইলমের মজলিস দেখার জন্য রওয়ানা হন। গিয়ে দেখেন হাজার হাজার ছত্রের মাঝে আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক দরস দিচ্ছেন। তিনিও ছাত্রের ন্যায় পিছনে বসে হাদিস শুনতে লাগলেন। দরস শেষে সকল ছাত্র আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারকের সাথে মুসাফাহা করতে লাগলো। বাদশাহ হারুনের প্রতি তাদের কোন ভ্রুক্ষেপও নাই। বাদশাহ মাথা নিচু করে প্রাসাদের দিকে রওয়ানা হলেন। মনে মনে ভাবতে লাগলেন আমিও যদি তার মত হতাম কতই না ভাল হতো। ঘটনাটি ৪১ তম বিশ্ব ইজতেমার রবিবার আছরের পর হযরত মাওলানা জুবাইরুল হাসানের জবান থেকে শুনেছি

প্রিয় পাঠক! মনে রাখতে হবে মা-বাপ যখন দীনদার হয় তখন তার প্রভাব সন্তানদের উপর পড়ে, ফলে সন্তান ও দ্বীনদার হয়। যার উজ্জল দৃষ্টান্ত আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক।

মা-বাবা দ্বীনদার না হওয়ার কারণে সন্তানরা বেদ্বীন হচ্ছে, সন্ত্রাস হচ্ছে, মদখোর, জুয়াখোর, হিরোইনখোর, গাজাখোর, ডাকাত, লুণ্ঠনকারী হচ্ছে।

বাবা-মা দ্বীনদার হলে অবশ্যই সন্তানদেরকে দ্বীনদার বানাতো। মা-বাবার ভিতরে দ্বীনদারী না থাকার কারণে মা বাবাই মনে করেন ইসলামী শিক্ষা তথা মাদ্রাসার শিক্ষা হলো ভিক্ষার শিক্ষা। এই শিক্ষা আমার সন্তানদেরকে পর নির্ভরশীল করবে। তাই তারা সন্তানদেরকে অনৈসলামিক শিক্ষায় শিক্ষিত করছে। যার ফলে পরবর্তীতে দেখা যায় এই সন্তানই মা বাবার আবাধ্য হচ্ছে। উশৃংখল জীবন যাপন করছে। অনেক মা বাবাকে দেখেছি আবাধ্য সন্তানকে বাধ্য করার জন্য ইমাম সাহবেদের কাছে

তাবীজের জন্য দাঁড়িয়ে থাকতে। এই সবই সন্তানকে অনৈসলামিক শিক্ষায় শিক্ষিত করার কুফল।

প্রিয় পাঠক! বাংলাদেশের একজন প্রখ্যাত ব্যক্তিকে তার আমেরিকা পড়ুয়া ছেলে মদের টাকা না পেয়ে পিতাকে গুলি করছে। এটাতো অনৈসলামি শিক্ষার ফসল। আবার অনেক ছেলে তো মা বাবা থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। তাদের কোন খবরই রাখে না।

একটি ঘটনা মনে পড়ল। পিতা আর পুত্র একই বিল্ডিংয়ে থাকে। পিতা নিচের তলায় থাকে আর পুত্র দোতলায় থাকে। একবার ছেলের এক বন্ধু তাকে খুঁজতে এসে ছেলের পিতাকে জিজ্ঞাসা করলো খালু, আপনার ছেলে কোথায়? জবাবে তিনি বললেন, তার সাথে অনেক দিন যাবত দেখা হয় না। লোকটি জিজ্ঞাসা করলেন খালু, কতদিন যাবত দেখা নাই? উত্তরে মুরুব্বী বললো, চৌদ্দ বছর যাবত দেখা নাই। বন্ধু চিন্তা করলো হয়তো বহুদূরে থাকে তাই দেখা হয় না। তারপর সে জিজ্ঞাসা করলো খালু! আপনার ছেলে কোথায় থাকে? উত্তরে মুরুব্বী বললো, আমার এই বিল্ডিংয়ের দ্বিতীয় তলায়। ইহা হলো অনৈসলামিক শিক্ষার কুফল।

তাই আসুন! আমারা আজ থেকে তাওবা করি এবং সন্তানদেরকে ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত করে গড়ে তুলি। তাহলে আমরা দুনিয়াতে সফলকাম হবো এবং আখরাতে ও সফলকাম হবো। এই আলেমও হাফেজ সন্তান আমার আপনার জন্যে পরকালে নাজাতের উসিলা হবে। আল্লাহ আমাদেরকে তৌফিক দান করুন।

তুমি শুধু উটের কেনা মূল্যেরই হকদার

খলিফা হযরত ওমর রা. এর খেলাফতের যুগে একবার বাজারে একটি অত্যন্ত হৃষ্টপুষ্ট মাংসল উট বিক্রি হচ্ছিল। খলিফা উমর রা. উটটি দেখে জিজ্ঞাস করলেন এ উট কার? বলা হল আপনার পুত্রের। খলিফা ছেলেকে জিজ্ঞাসা করলেন, এই উট কোথা থেকে পেয়েছো? প্রতি উত্তরে সে বললো, একে ক্রয় করে সরকারী চারণ ভূমিতে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। এখন মোটা তাজা হয়েছে তাই নিয়ে এসেছি বিক্রি করতে। খলিফা উমর বললেন, এ উট

সরকারী চারণ ভূমি খেয়ে মোটা হয়েছে। জনসাধারণ একে আমীরুল মুমিনীনের ছেলের উট মনে করে যত্ন সহকারে লালন পালন করেছেন। এই জন্য তুমি শুধু এ উটের কেনা মুল্যেরই হকদার। তিনি উট বিক্রি করে মূল পুঁজি পুত্রকে দিয়ে দিলেন এবং লভ্যাংশ রাষ্টীয় কোষাগারে জমা রেখে দিলেন। (দৈনিক ইনকিলাব পত্রিকার ইসলামের দর্শন পৃষ্ঠা)

ইহাই ছিলো সোনালী যুগের শাসন ব্যবস্থা। জনগণের অধীকার সম্পর্কে তাঁরা কত সচেতন ছিলেন। স্বজনপ্রীতির লেশমাত্রও তাদের মধ্যে ছিল না। সকলেই ছিলো তাদের চোখে সমান। তাই তো তাঁদের যুগে বাঘ আর বকরী এক ঘাটে পানি পান করতে পেরেছে। আজ তো বাঘ বকরী দূরের কথা দুইজন মানুষ একসাথে অবস্থান করতে পারে না। আজ মানুষের মাঝে হিংস্রতা, ক্ষিপ্রতা, অপরাধ প্রবণতা এতো বেড়ে গেছে যে, মানুষ একটি হিংস্রপ্রাণীকে দেখলেও এত ভয় পায় না, মানুষ মানুষকে দেখলে যত ভয় পায়। আর স্বজনপ্রীতি পুরা দেশে ছেয়ে গেছে। যা যোগ্য লোকদেরকে তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করছে আর এগুলো সবই হচ্ছে সুশাসন না থাকার কারণে। তাই আসুন সোনালী যুগের শাসকদেরকে অনুসরণ করি। তাহলে ফিরে আসবে শান্তি। প্রতিষ্ঠিত হবে ন্যায়বিচার, দৃঢ় হবে সামাজিক বন্ধন। দূর হবে জাগতিক বৈষম্য এবং গড়ে উঠবে সম্পর্কের ভারসাম্য। সৃষ্টি হবে সম্প্রীতি। ফুটে উঠবে জনগণের মুখে হাসি।

হজ্বে না গিয়ে ও হজ্ব কবুল হওয়ার চমৎকার ঘটনা

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক ছিলেন একজন বিশিষ্ট আলেম ও সম্পদশালী বুযুর্গ। একবার তিনি হজ্জে যাচ্ছিলেন, পথিমধ্যে লক্ষ করলেন একটি যুবতি মেয়ে রাস্তা থেকে মরা মুরগী কুড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। কাছে গিয়ে মরা মুরগী কুড়িয়ে নেওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন, মেয়েটি বলতে সঙ্কোচবোধ করছিল। অনেক পীড়াপীড়ির পর সে বলল, তার ছোট্ট একটি ভাই আছে, পরিবারে আর কেউ নেই। অনেক দিন যাবত তার উপোস ভাইয়ের আর্তনাদে সে অতিষ্ট। কোন উপায় না পেয়ে এই হারাম বস্তু দ্বারা ক্ষুধা নিবারণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

বিষয়টি আব্দুল্লাহ্ বিন মুবারকের মনে খুব বেদনাদায়ক রেখাপাত করল। তিনি চিন্তা করলেন হজ্বের অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে পারস্পারিক ভ্রাতৃত্ব ও মানবতাবোধ। তিনি এত টাকা খরচ করে হজ্বে যাচ্ছেন অথচ অন্যরা না খেয়ে মরছে, তাহলে এ হজ্ব দ্বারা কি লাভ হবে? আল্লাহ মানুষের আমল দেখেন না তার নিয়ত দেখেন। তাই তিনি বাড়ি ফেরার টাকা রেখে বাকি সব টাকা ঐ মেয়েকে দিয়ে দিলেন। বাড়ীতে এসে আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক রাতে ঘটনাটি নিয়ে চিন্তা করতে করতে ঘুমিয়ে পড়লেন। স্বপ্নে তাকে দেখানো হল তার হজ্ব কবুল হয়ে গিয়েছে।

প্রিয় পাঠক! আপনার জেনে রাখা দরকার সামর্থবানদের উপর জীবনে একবার হজ্ব করা ফরজ, তারপর যতবার হজ্ব করবে তা হবে নফল। আমাদের সমাজের বহু লোক প্রতি বছর এই নফল ইবাদত করার জন্য টাকা ব্যয় করে হজ্বে যাচ্ছেন। অথচ আমাদের দেশের অর্থ সমাজিক পরিস্থিতি ও অর্থনৈতিক দৈন্যদশার কথা সবার জানা। এদেশের সিংহ ভাগ মানুষ এখনো বাস করছে দারিদ্র সীমার নিচে। তারা নুন্যতম মৌলিক অধিকারটুকু থেকেও বঞ্চিত। খাদ্যের অভাবে মানুষ বুভুক্ষ হয়ে ঘুরছে, চিকিৎসা না পেয়ে অকালে ঝরে পড়ছে কত বনি আদম। সামান্য বস্ত্রের অভাবে কষ্ট করে যাচ্ছে কত মানুষ। হাজারও মানুষের কাছে ইসলামী শিক্ষার আলো এখনো পৌঁছে নাই। তাই তো তাদের অশিক্ষা এবং দারিদ্রতার সুযোগ নিয়ে এ দেশের এক শ্রেণী তাদের ঈমান হরণ করার অপচেষ্টা করছে। এহেন পরিস্থিতিতে সমাজের অবস্থা পরিবর্তনে সকলের চেষ্ট করা একান্ত ঈমানী দায়িত্ব।

কেউ নফল ইবাদাতে অর্থ খরচ করবে তাতে বাধা দেওয়ার করো অধিকার নেই। কিন্তু সাথে সাথে সামাজিক দায়বদ্ধতা, গরীব দ:খীর প্রতি কর্তব্য ও প্রতিবেশীর অধিকার, সর্বোপরি মানবিক চেতনাবোধ এগুলো তো কেউ এড়িয়ে যেতে পারবে না।

অতএব,আপনার অর্থগুলো পরিকল্পিতভাবে দারিদ্র বিমোচন, ইসলামী শিক্ষা ও অর্থ সমাজিক খাতে খরচ করলে আপনার নফল ইবাদতের চেয়ে বেশী সওয়াব হবে এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায়। যার ফলশ্রুতিতে মানুষ মুক্তি পেত দারিদ্রতার অভিশাপ থেকে। ঘরে ঘরে পৌঁছে যেত ইসলামী শিক্ষার

আলো। সর্বোপরি মানুষ ঈমানের মত মহা দৌলতকে হেফাজত করতে পারতো ।

আব্দুল্লাহ ইবনে মোবারক রহ. এর ওই ঘটনা থেকে আমাদের শিক্ষা নেওয়া উচিত। সম্পদশালীদের এও জেনে রাখা উচিত যে, সমাজের অবস্থা পরিবর্তন করা তাদের অন্যতম দায়িত্ব। তাই আসুন দারিদ্র বিমোচনে অর্থ ব্যয় করি, গরীব দু:খীদের পাশে দাঁড়াই তাতে অনেক বেশী সওয়াব হবে তা নি:সন্দেহে বলা যায়।

সোনালী যুগের রমজান মাসের ঘটনা

একবার হযরত বেলাল রা. রাসূলে কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর খেদমতে এসে দেখেন যে, রাসূল কারিম সা. হযরত আলী রা. এবং হযরত আলকামা ইবনে ওলাফা রা., সেহরী খাচ্ছেন। হযরত বেলাল রা. বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ সা.! সুবহে সাদিক হয়ে গিয়েছে। এই বলে হযরত বেলাল মসজিদ চলে গেলেন। আযান দেওয়ার পূর্বে মনে মনে ভাবলেন যে, হুজুর সা. কে আবার দেখে আসি, গিয়ে দেখেন যে হুজুর সা. এখনো সেহরী খাচ্ছেন। হযরত বেলাল রা. বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ সা.! আল্লাহর কসম! সুবহে সাদিক হয়ে গেছে। একথা বলার সঙ্গে সঙ্গে রাসূলে কারিম সা. হাত মুবারক খানা থেকে উঠিয়ে নিলেন এবং বললেন, হে বেলাল! আসলে সুবহে সাদিক হয়নি। তবে তোমার কসম খাওয়ার পর সুবহে সাদিক হয়েছে। (হযরত তারিক জামিলের বয়ান থেকে সংগৃহিত)

ইহাই ছিল হযরত বেলাল রা. এর সাথে আল্লাহ তায়ালার গভীর সম্পর্ক। কথায় আছে 'আল্লাহর সাথে যার থাকে ভাব তার থাকে না কোন অভাব'। তাই তো দেখা যায় আল্লাহ ওয়ালারা আল্লাহর নামে যখন কোন কসম খায় আল্লাহ তায়ালা তা পূর্ণ করেন। আল্লাহ তাদের কথা সাথে সাথে কবুল করে নেন।

বেশি দিন আগের কথা নয় হযরত হাফেজ্জী হুজুর রাহ. এর সময় একবার বৃষ্টি হচ্ছিল না। তৎকালীন প্রেসিডেন্ট হাফেজ্জী হুজুর রাহ. এর খেদমতে এসে বৃষ্টির জন্য দোয়া করার আবেদন করলেন। হযরত হাফেজ্জী

হুজুর রাহ. সকলকে নিয়ে ঐতিহাসিক কেল্লার মাঠে দোয়া শুরু করলেন। অংশগ্রহণকারীরা বললেন, দোয়া চলাকালীন সময় বৃষ্টি পড়া শুরু হয়ে গেছে।

তাই আসুন! ঈমান ও আমালের মাধ্যমে আল্লাহর সাথে ভাব সৃষ্টি করি। তাহলে দেখবেন আমাদের জীবনে কোন অভাব থাকবে না।

পরিশেষে মুজাহিদে মিল্লাত হযরত শামসুল হক ফদিপুরী রাহ. (সদর) সাহেব হুজুর এর উক্তি দ্বারা লেখাটি শেষ করছি। আমার উস্তাদদের মুখে শুনেছি সদর সাহেব হুজুর প্রায় বলতেন, 'তুমি দুনিয়ার সবকিছু পেয়োছো,কিন্তু আল্লাহকে পাওনি, আল্লাহর কসম! তুমি কিছুও পাওনি। আর তুমি দুনিয়ার কিছুই পাও নাই, কিন্তু আল্লাহকে পেয়োছো তবে তুমি সব পেয়োছো'।

জটিল মাসআলার সহজ সমাধান

একবার এক লোক ইমাম আবু হানিফা রাহ. এর কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলো যে, কোন এক ব্যক্তির হাতে পানি ভর্তি একটা পেয়ালা ছিলো। লোকটি তার স্ত্রীকে সম্বোধন করে বললো, আমি যদি এ পানি পান করি অথবা ফেলে দেই অথবা পানি ভর্তি এ পেয়ালা মাটিতে রেখে দেই কিংবা কাউকে দিয়ে দেই তাহলে তুমি তালাক। সুতরাং সে যদি চার অবস্থার কোন একটি অবলম্বন করে তাহলে তার স্ত্রীর উপর তালাক পড়ে যাবে। এখন প্রশ্ন হলো, এমন কোন পদ্ধতি আছে কিনা যা অবলম্বন করলে তালাক পড়বে না। ইমাম সাহেব বললেন, হ্যাঁ আছে, সে একটা শুকনা কাপড় পেয়ালার মধ্যে ভিজিয়ে পেয়ালার সব পানি শুকিয়ে ফেলবে। যখন তাতে এক ফোটা পানিও থাকবে না তখন পেয়ালা মাটিতে রেখে দিবে তাহলে আর তালাক পড়বে না।

এ ঘটনা দ্বারা বুঝা যায় যে, ইমাম আবু হানিফা রাহ. কত বড় বিচক্ষণ ও বিদ্বান পন্ডিত ছিলেন। তাঁর জীবনের প্রতিটি দিক এতই আকর্ষণীয় ছিল যে, সব শ্রেণীর মানুষ পতঙ্গের মত তার খেদমতে ছুটতো। রাজা-বাদশাহ, মন্ত্রি-সচিব, আলেম-উলামা, কাজী-বিচারক সব শ্রেণীর লোকই তার ভক্ত

ছিল। পাশাপাশি শত্রু ও হিংসুকের ও কোন কমতি ছিল না। তারা ইমাম সাহেবের বিরুদ্ধে সর্বদা অপপ্রচারে লিপ্ত ছিল। চার ইমামের মধ্যে তাঁর মত এত শত্রু আর কারো ছিল না এবং সে ধারা আজও সমানভাবে জারি রয়েছে।

যারা নিজেদেরকে হাদিসের অনুসারী বলে দাবী করে, কিন্তু শরীরে সুন্নতী পোশাক নেই, মুখে দাঁড়ী নেই, টাখনুর নিচে প্যান্ট গড়াগড়ি খাচ্ছে, ঘরে পর্দা নেই। অথচ তারাই ইমাম সাহেবের বিরুদ্ধে দু'চার কথা বলতে পারলে নিজেদেরকে খুব ধন্য মনে করে। অথচ তারা এটা উপলব্ধি করতে পারে না যে, তারা নিজের অজান্তে নিজের কত বড় ক্ষতি করে চলছে।

আমার কাছে একবার ক্ষমা চাইলে আমি ক্ষমা করে দিতাম

বণী ইসরাঈলে একজন বড় ব্যবসায়ি ছিল। তার নাম ছিল কারুন। কোটি কোটি টাকার মালিক ছিল। ইবনে আব্বাসের বর্ণনা মতে কারুন মুসা আ. এর চাচাতো ভাই ছিল। কারুনের অর্থের পরিমাণ এত বেশী ছিল যে, তার গুদামের চাবি বহন করা একদল শক্তিশালী লোকের পক্ষেও কঠিন ছিল। অথচ চাবি হালকা চাবি হালকা হয়ে থাকে। তাহলে কতগুলো চাবি হলে তা বহন করা কষ্ট সাধ্য হতে পারে তা সহজে অনুমান করা যায়। কিন্তু সে এ সম্পদের মোহে পড়ে আল্লাহর অবাধ্য হয়ে যায়। এবং সম্পদ নিয়ে অহংকার করতে থাকে।

মুসা আ. তাকে সম্পদ নিয়ে বড়াই করতে নিষেধ করলেন এবং সম্পদের হক তথা যাকাত, দান খায়রাত আদায় করতে নির্দেশ দিলেন। প্রতি উত্তরে কারুন গর্জে উঠল এবং বলতে লাগল, এ সম্পদ আমি আমার জ্ঞানের দ্বারা অর্জন করেছি। তাতে কারে কোন অধিকার নাই। এবং সে যাকাত দিতে অস্বীকার করলো। এবং মুসা আ. কে অপমান করার জন্য বিভিন্ন চক্রান্ত করতে লাগলো। ফলে মুসা আ. আল্লাহর দরবারে কারুনের জন্য বদদোয়া করলেন। আল্লাহ তায়ালা মুসা আ. এর দোয়া কবুল করে জমীনকে মুসা আ. এর অধীনে করে দিয়েছিলেন। তখন মুসা আ. জমীনকে

লক্ষ্য করে করে বললেন, হে জমীন! কারুনকে গ্রাস করো। সাথে সাথে জমীন কারুনকে ধন সম্পদসহ গ্রাস করে নেয়। তখন কারুন অনেক কাকুতি মিনতি করে মুসা আ. কে বলতে লাগলো, মুসা, আমাকে ক্ষমা করুন। আমি সম্পদের যাকাত আদায় করবো, কিন্তু মুসা আ. তার কথায় কোন কর্ণপাতই করলেন না। উল্টো জমীনকে ধমক দিয়ে বললেন, তাকে জলদি গ্রাস করো। যখন কারুনের কোমর পর্যন্ত নিচে চলে গেল তখন কারুন আবার বিনয়ের সাথে বলতে লাগলো, মুসা, আমাকে ক্ষমা করো। আমি সম্পদের যাকাত আদায় করবো। কিন্তু মুসা আ. উল্টো জমীনকে ধমক দিতে লাগলেন। যখন জমীন কারুনের গলা পর্যন্ত গ্রাস করে নেয় তখন কারুন শেষবারের মত মুসা আ. এর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে কিন্তু ক্ষমা করেননি।

এভাবে কারুন সম্পদসহ জমীনের নিচে ডেবে যায়। পরে আল্লাহ তায়ালা ওহীর মাধ্যমে মুসা আ. কে বললেন, মুসা, কারুন তোমার কাছে তিনবার ক্ষমা চেয়েছিল তুমি ক্ষমা কর নাই। যদি কারুন একবার আমার কাছে ক্ষমা চাইতো সাথে সাথে আমি ক্ষমা করে দিতাম। (তারিক জামিলের বয়ান থেকে সংগৃহিত)

কারুন তার সম্পদ নিয়ে অহংকার করেছে সম্পদের হক তথা গরীব দু:খীদের হক আদায় করেনি। ফলে আল্লাহ তাকে জমীনের নিচে ডাবিয়ে দিয়েছেন। বর্ণনা অনুযায়ী কিয়ামত পর্যন্ত সে ডাবতে থাকবে।

আজও কারুনি চিন্তা ধারার অনেক মানুষ খোঁজে পাওয়া যায়; যারা সম্পদ নিয়ে অহংকার করে। তার সম্পদে গরবি দু:খীদের অধিকার যে আছে একথা সে মনেই করে না। অথচ আল্লাহ তায়ালা কোরআনে বলেছেন,

وفى اموالهم حق للسائل والمحروم

অর্থাৎ তোমাদের সম্পদের মধ্যে ভিক্ষুক ও বঞ্চিতদের অধিকার রয়েছে। আজ আমাদের দেশে হাজার হাজার লোক দারিদ্র ও পীড়িত হয়ে যাযাবরের মত জীবন যাপন করছে। সামান্য বস্ত্রের জন্য পেরেশান হয়ে মানুষের দ্বারে দ্বারে ঘুরছে। যদি সম্পদশালীরা তাদের সম্পদের হক তথা দান খয়রাত ও যাকাত, আদায় করত তাহলে দারিদ্রতা অনেকটা কমে যেত। বিশেষ করে যদি শুধু যাকাত ঠিক মত আদায় করে এবং পরিকল্পিতভাবে খরচ করে

তাহলে কোন এক সময় দেখা যবে যাকাত দেওয়ার লোক থাকবে কিন্তু যাকাত নেওয়ার লোক থাকবে না। কিছু দিনের মধ্যে দেশের অবস্থা বদলে যাবে। একজন গবেষক তার বিশেষ কলামে লিখেছেন যে, এ দেশের অবস্থা বদলে দিতে পারে এদেশের ১৪ কিংবা ১৫ কোটি মানুষের মধ্যে মাত্র ৫০ হাজার মানুষ। তা এভাবে যে, এদেশে ৫০ হাজার কোটিপতি আছে। যাদের প্রত্যেকের কমপক্ষে ১ কোটি করে টাকা আছে। তাহলে টাকার পরিমাণ দাঁড়াচ্ছে ৫০ হাজার কোটি টাকা। ৫০ হাজার কোটি টাকার যাকাত আসে ১২৫০ কোটি টাকা। এ টাকা ৭০ হাজার গ্রামে ভাগ করে দিলে প্রতি গ্রামে পাবে একলক্ষ আটাত্তর হাজার পাঁচশত একাত্তর টাকা। এবার প্রতিটি গ্রাম থেকে২০/৩০ টি সবচেয়ে দু:স্থ পরিবার নির্বাচন করে তাদের এ টাকা দিয়ে একটি স্থায়ী কর্মের ব্যবস্থা করে দিলে ১০ বছর পরে নিশ্চয় একটি বিরাট পরিবর্তন দেখা যাবে গ্রামগুলোতে।

প্রিয় পাঠক! হয়ত বলতে পারেন, হাজার হাজার বছর আগের কারুনের ঘটনা হাজার হাজার বছর পর আমাদেরকে শুনাচ্ছেন কেন? একটু ভেবে দেখেছেন কি? ইহা এজন্যই শুনাচ্ছি কারণ যেভাবে কারুন সম্পদ নিয়ে অহংকার করেছে এবং সম্পদের হক আদায় করেনি ফলে তাকে জমীন গ্রাস করে নিয়েছে। আমরাও যদি সম্পদ নিয়ে অহংকার করি এবং সম্পদের হক আদায় না করি তাহলে আমাদেরও কারুনের পরিণতি ভোগ করতে হবে। তাই আসুন, সবাই ঠিকমত যাকাতও দান খায়রাত করে সম্পদের হক আদায় করি।

আব্দুল্লাহ্ উন্দুলুসীর ঘটনা

হযরত শায়েখ আব্দুল্লাহ উন্দুলুসী উন্দুলুসের অন্যতম বুযুর্গ ছিলেন। ইরাকের অধিকাংশ মানুষের পথ প্রর্দশক, পীর ও মুরশীদ ছিলেন। তাঁর মুরিদের সংখ্যা ১২ হাজারে পৌঁছেছিল। বহু খানকাহ তাঁর দ্বারা আবাদ হয়েছিল। বহু মাদরাসা তার তাঁর ফয়েজ ও বরকতের দুআয় জারী ছিল। তিনি বহু আলেমের উস্তাদ ও বিখ্যাত মুহাদ্দিস হিসাবেও খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। কোরআনের সাত কেরাতের কারী ছিলেন। হাফেজে হাদিস

অর্থাৎ ৩০ হাজার হাদিস সনদসহ মুখস্থ ছিল।তাকওয়া ও পরহেজগারীতে অদ্বিতীয় ছিলেন। ফরীদুদ্দীন শিবলী এবং জুনাইদ বোগদাদীর মত ব্যক্তি তার মুরিদ ছিলেন। তাঁরই একটি হৃদয় বিদারক ঘটনা যা মুসলমানের জন্য একটি চির শিক্ষণীয় ঘটনা হিসাবে কাজে আসবে।

একবার তিনি সফরের উদ্দেশ্য বের হলেন। তাঁর সফর সঙ্গী হিসাবে মুরিদের বিশাল এক কাফেলাও ছিল। যাদের মধ্যে জুনাইদ বোগদাদী ও হযরত শিবলী রাহ.ও ছিলেন। ঘটনার বর্ণনাকারী হযরত শিবলী রহ. বলেন, আমাদের কাফেলা আল্লাহর মেহেরবাণীতে খুবই খায়ের ও বরকতের সাথে চলছিল। চলতে চলতে আমাদের কাফেলা এক খ্রীষ্টান পল্লীতে প্রবেশ করলো। এদিকে নামাজের সময় সংকীর্ণ হয়ে আসছিল। কিন্তু অনুসন্ধান করে পল্লীতে কোন পানি পাওয়া গেল না। অবশেষে আমরা যেতে যেতে পল্লীর বাহিরে একটি কুপ দেখতে পাই তথায় বেশ কিছু পোড়শী পানি ভরছিল। ঘটনাচক্রে শায়েখ আব্দুল্লাহ উন্দুলুসীর দৃষ্টি উপস্থিত মেয়েদের একজনের উপর বিদ্ধ হলো। যার খোদা প্রদত্ত সৌন্দর্য ছিল অতুলনীয়। সেই সাথে স্বর্ণ অলংকারের সাজ সজ্জা তাকে করে তুলেছিল আরো অধিক আকর্ষণীয়।

মেয়েটির প্রতি দৃষ্টি পড়ার সাথে সাথেই শায়েখের অবস্থা নাজুক হতে লাগলো। এবং চেহারার মধ্যে বিরাট এক বিবর্তন পরিলক্ষিত হতে লাগলো। শায়েখ যুবতীর সখীদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন এই যুবতী কার সন্তান? সখীদের পক্ষ থেকে বলা হল, এই বস্তির সর্দারের মেয়ে। শায়েখ বললেন, সর্দারের মেয়ে হওয়া সত্ত্বেও তাকে এত কষ্টের মাঝে রেখেছে কি কারণে? সর্দারের কি ক্ষমতা নেই তার সুন্দরী মেয়ের পরিবর্তে কোন চাকর বাকর রেখে পানি উঠানোর ব্যবস্থা করার। উপস্থিত মেয়েরা বললো, তা থাকবে না কেন? কিন্তু তার পিতা খুবই বুদ্ধিমান। সে ধন সম্পদও মান সম্মানের অহংকারে পড়ে স্বভাব চরিত্র যেন বিনষ্ট না করে এজন্য তিনি এমন করছেন। এমন হলে বিবাহের পর স্বামীর সেবা যত্নে অনিচ্ছুক হয়ে পড়বে। তাই তিনি নিজের মেয়ের দ্বারা কাজ নিয়ে তাকে আদর্শ মানুষ হিসাবে গড়ে তুলতে চান।

হযরত শিবলী রহ. বলেন, শায়েখ তার সাথে তার সাথে কথোপকথনের পরে মাথা নিচু করে জমীনে বসে পড়লেন। এক বসাতেই তিন দিন অতিবাহিত হয়ে গেল। পানাহার সবকিছুই ছেড়ে দিলেন। কারো সাথে একটি কথাও বললেন না। শুধু নামাজের সময় হলে নামাজ পড়েন। তার সাথে অসংখ্য ছাত্র ছিল। সবাই ছিল পেরেশান। কেউ তাঁর সাথে একটি কথা বলারও সাহস পেল না। হযরত শিবলী রাহ. বলেন, তৃতীয় দিন আমি নিজেই হিম্মত করে শায়েখের কাছে আরজ করলাম, হে আমাদের শায়েখ! আপনার হাজর হাজার মুরিদ সকলেই পেরেশান। দয়া করে বলুন, কেন আপনার এ অবস্থা হয়েছে? এবার শায়েখ সফর সঙ্গীদের দিকে দৃষ্টিপাত করে বললেন, আমার প্রাণ প্রিয় ছাত্র ও ভক্তবৃন্দ! আমি নিজের অবস্থা কতক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের থেকে গোপন রাখবো। গত পরশু যে মেয়েটি আমি দেখেছি তার ভালবাসা আমার অঙ্গে প্রতঙ্গে প্রবেশ করেছে। এখন আর এই স্থানকে ত্যাগ করে যাওয়া আমার পক্ষে কিছুতেই সম্ভব নয়। একথা শুনার পর হযরত শিবলি রাহ. বললেন, হে আমাদের সর্দার! আপনি ইরাক বাসীর পীর মুরশেদ। আপনার ইলম ও ফজল তাকওয়া পরহেযগারী এবং আপনার ইবাদত বন্দিগী খ্যাতির শীর্ষে রয়েছে। আপনার মুরিদের সংখ্যা ১২ হাজার অতিক্রম করেছে। কোরআনের দোহাই দিয়ে বলছি, আপনি আমাদেরকে অপমান করবেন না।

প্রতি উত্তরে শায়েখ বললেন, আমার প্রাণ প্রিয় ভক্তবৃন্দ! আমার এবং তোমাদের ভাগ্যের ফায়সালা এবং তকদিরের লিখন আল্লাহ তায়ালা চুড়ান্ত করে রেখেছেন। আমার বেলায়েতের খোদা প্রদত্ত বিশেষ মর্যদা পোশাক ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে। হেদায়েতের সকল আলামত তুলে নেয়া হয়েছে। এতটুকু বলে শায়েখ কান্না শুরু করলেন। অত:পর শায়েখ অশ্রুশিক্ত কণ্ঠে বললেন, হে আমার কওম! তকদীরের ফায়সালা চুড়ান্ত হয়ে গিয়েছে। এখন আমার নিয়ন্ত্রণে কিছুই নাই।

হযরত শিবলী রাহ. বলেন, আকস্মিক এমন একটি ঘটনায় আমাদের মাঝে চরম হাতাশা নেমে এল। আক্ষেপে আমরা সকলেই কাঁদতে লাগলাম। শায়েখও আমাদের সাথে কাঁদতে লাগলেন। এমন কি সকলের অশ্রুতে

সেখানের মাঠ যেন সিক্ত হল। শেষ পর্যন্ত আমরা বাধ্য হয়ে শায়েখকে সেখানে রেখে স্বীয় দেশ বাগদাদের দিকে রওয়ানা হলাম।

আমরা যখন গিয়ে পুরো ঘটনা শুনালাম তখন শায়েখের মুরিদদের মাঝে কান্নার রোল শুরু হল। এমনকি কিছু লোক দু:খে, আক্ষেপে কাঁদতে কাঁদতে আখেরাতে পাড়ি জমাল। আর যারা জীবিত ছিল তারা আল্লাহর দরবারে এই বলে আহাজারী ও রোনাজারী করতে লাগলো হে মানুষের অন্তর পর্বিতনকারী আল্লাহ! তুমি আমাদের শায়েখের হেদায়েতের পথ প্রশস্ত করে দাও এবং পুনরায় তাকে তার পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে দাও।

তারপর বাগদাদের সব কয়টি খানকাহ বন্ধ হয়ে গেল। এভাবে শায়খের বিচ্ছেদের পর হতাশা ও আক্ষেপের একটি বছর পার হয়ে গেল।

হযরত শিবলী রাহ. বলেন, এক বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর আমাদের ইচ্ছা হল শায়েখ কোন অবস্থায় আছে কোথায় আছে তা দেখার জন্য। তাই আমরা একটি জামাত সফরে বের হলাম। অত:পর যে গ্রামে আমরা শায়েখকে রেখে এসেছি ঐ গ্রামে পৌঁছে লোকদের কাছে এসে শায়েখের অবস্থা জিজ্ঞাসা করলাম। তখন গ্রামবাসীরা বললো, তিনি ঐ জঙ্গলে শুকর চরান।

এ সংবাদ শুনে আমরা আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করে বললাম, একি অবস্থা হল! গ্রামবাসীরা বললো, তিনি সর্দারের মেয়েকে বিবাহ করা প্রস্তাব দিয়েছিলেন। সর্দার দুইটি শর্তের ভিত্তিতে এ প্রস্তাব কবুল করেছেন। (এক) তাকে খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণ করতে হবে (২) এক বছর সর্দারের শূকর চরাতে হবে। তাই তিনি জঙ্গলে শূকর চরানোর কাজ করছেন।

একথা শুনার পর আমরা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লাম। মনে হলো আক্ষেপে আমাদের কলিজা ফেটে যাচ্ছে। আমাদের চোখ দিয়ে অশ্রু প্রবাহিত হতে লাগলো। খুব কষ্টে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করে আমরা জঙ্গলের দিকে রওয়ানা হলাম । যেখানে শায়েখ শূকর চরাচ্ছে। জঙ্গলে পৌঁছে আমরা দেখতে পেলাম শায়খের মাথায় খৃষ্টানদের টুপি এবং কোমরে খৃষ্টানদের ক্রুশ লটকে আছে। আর ঐ লাঠির উপর ভর দিয়ে তিনি শূকর পালের সামনে

দাঁড়িয়ে আছেন যে, লাঠির উপর দিয়ে ভর দিয়ে তিনি ওয়াজ নসিহত ও খুতবা দিতেন। শায়েখের এ অবস্থা দেখে আমাদের কাটা গায়ে লবন ছিটানোর মত হলো। আমাদেরকে আসতে দেখে শায়েখ মাথা নিচু করে নিলেন। আমরা কাছে পৌছে 'আসসালামু আলাইকুম' বললাম। শায়েখ খুব ক্ষীণ কণ্ঠে ও 'ওয়ালাইকুমুস সালাম' বললেন।

হযরত শিবলী রহ. বলেন, হে আমাদের শায়খ! ইলম ফজল কোরআন ও হাদীসের বিশাল জ্ঞান ভান্ডার থাকার পর ও আজ আপনার এ কি অবস্থা? শায়েখ বললেন, আমার প্রাণ প্রিয় বন্ধুগণ! আমার নিয়ন্ত্রণ আমার হাতে নেই। আমার মাওলা আমাকে যেমন ইচ্ছা করেছেন তেমনি করে দিয়েছেন। আমাকে এত কাছে নেওয়ার পর যখন তিনি তাঁর দরবার থেকে তাড়িয়ে দিলেন, তখন আর কার সাধ্য আছে তার ফায়সালাকে রদ করতে পারে।

হে আমার প্রানপ্রিয় ভক্তবৃন্দ! মহান আল্লাহ তায়ালার গজব ও কহরকে ভয় কর, নিজের জেহান ও গরিমার উপর কখনো অহংকার করো না। তারপর তিনি আসমানের দিকে চোখ উঠিয়ে বললেন, হে আমার মাওলা! তোমার সম্পর্কে আমার এমন ধারণা ছিল না যে, তুমি আমাকে অপমান অপদস্ত করে তোমার দরজা থেকে তাড়িয়ে দিবে। এ কথা বলে তিনি আল্লাহ তায়ালার আশ্রয় প্রার্থনা করতে লাগলেন এবং অঝোর ধারায় কাঁদতে লাগলেন এবং বললেন, হে শিবলী! শিক্ষা গ্রহণ কর। হযরত শিবলী কান্না বিজড়িত কণ্ঠে বললেন, হে আমাদের পরওয়ারদগার! আমরা আপনারই সাহায্য প্রার্থনা করছি। এবং যাবতীয় কাজ কর্মে আপনার উপরই ভরসা করি। আমাদের থেকে এ মুছিবত দূর করে দাও। তুমি ছাড়া এই মহাবিপদ দূর করার সাধ্য আর কারো নাই।

তাদের কান্না এবং হৃদয়বিদারক আওয়াজ শুনে জঙ্গলের বিক্ষিপ্ত শূকরগুলো পর্যন্ত একত্রিত হল। এবং এই অবুঝ প্রাণীগুলো চিৎকার করে কাঁদতে শুরু করলো। এদিকে শায়েখও অঝোরে কাঁদতে লাগলো। শায়েখের কান্না, অসংখ্য ভক্তবৃন্দের আত্মচিৎকার, অবুঝ প্রাণীর ছটফটানির আওয়াজ জঙ্গলের পরিবেশ ভারি হয়ে এমন এক করুন দৃশ্যের সৃষ্টি হল যা বর্ণনাতীত

তারপর হযরত শিবলী রহ. জিজ্ঞাসা করলেন হে শায়েখ! আপনি হাফেজে কোরআন ছিলেন। কোরআনকে সাত কেরাতে পড়তে পারতেন। এখনও কি কোন আয়াত স্মরণ আছে? শায়খ বললেন, বন্ধু, আমার কোরআনের মাত্র দুইটি আয়াত ছাড়া আর কোন আয়াত স্মরণ নেই, এক,

وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ

অর্থ : আল্লাহ তায়ালা যাকে লাঞ্ছিতও অপমানিত করেন তাকে কেউ সম্মানের আসনে সমাসীন করতে পারে না। নিশ্চয় আল্লাহ যা চান তা করেন।

وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ

অর্থ : যে ব্যক্তি ঈমানের পরিবর্তে কুফরী গ্রহণ করল, সে সঠিক পথ থেকে গোমরাহ হয়ে গেল। তারপর হযরত শিবলী রাহ. জিজ্ঞাসা করলেন সনদসহ আপনার ত্রিশ হাজার মুখস্থ ছিল, এখন কি আপনার কোন হাদিস স্মরণ আছে? জবাবে শায়েখ বললেন, মাত্র একটি হাদিস আমার স্মরণ আছে, আর সে হাদিসটি :

من بدل دينه

অর্থ: যে ব্যক্তি নিজের ধর্ম পরিবর্তন করে তাকে হত্যা কর।

হযরত শিবলী রাহ. বলেন, এ অবস্থা দেখে আমরা শায়েখকে সেখানে রেখে বাগদাদের উদ্দেশ্য রওয়ানা হলাম। মাত্র তিন মনজিল অতিক্রম করেছি হঠাৎ তৃতীয় দিন আমরা শায়েখকে আমাদের সামনে দেখতে পেলাম। তিনি একটি খাল থেকে গোসল করে উঠছেন এবং উচুঁস্বরে পড়তে ছিলেন।

اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله

শিবলী রহ. বলেন, ঐ সময় আমাদের আনন্দ ও খুশীর অবস্থা তারাই অনুভব করতে পারবে যারা ইতোপূর্বে আমাদের দু:খ কষ্ট হতাশার অবস্থা অনুধাবন করতে পেরেছে।

শায়েখ আমাদের কাছে এসে সর্বপ্রথম একটি পাক-পবিত্র কাপড় চাইলেন। কাপড় দেওয়ার পর শায়েখ নামাজের নিয়ত বাঁধলেন, আমরা শায়খের অবস্থা পরির্বতনের কথা জানার জন্য অপেক্ষা করছিলাম। অল্পক্ষণের মধ্যে শায়েখ নামাজ শেষ করে আমাদের দিকে ঘুরে বসলেন। আমরা শায়েখের উদ্দেশ্য বললাম, আল্লাহ তায়ালার হাজারো শুকরিয়া আদায় করছি, যিনি আপনাকে আমাদের সাথে দ্বীনি মুহাব্বতও ভালবাসার জাল ছিন্ন করে পুনরায় তা স্থাপন করে দিয়েছেন। আমরা বললাম, হে শায়েখ! কষ্ট করে বলবেন কি কিভাবে এ কঠিন পথ থেকে ফিরে আসা আপনার জন্য সম্ভব হলো?

শায়েখ বললেন, প্রাণ প্রিয় বন্ধুগণ! তিন দিন আগে তোমরা যখন আমাকে জঙ্গলে রেখে চলে আসলে তখন আমি আল্লাহর দরবারে খুব কান্নাকাটি করেছি। আহাজারী, রোনাজারী করেছি ও অনুনয় বিনয়ের সাথে এই দোয়া করেছি, হে আল্লাহ! আমি তোমার এক গোনাহার বান্দা! তুমি আমাকে এই বিপদ থেকে উদ্ধার কর, আমাকে মুক্তি দাও. আমার গোনাহকে ক্ষমা কর। আল্লাহ তায়ালা আমার যাবতীয় গোনাহ ক্ষমা করে পুনরায় তার আশ্রয়ে তুলে নিলেন।

তারপর আমরা জিজ্ঞাসা করলাম এ কঠিন পরীক্ষার কোন কারণ ছিল কি? জবাবে শায়েখ বললেন, হ্যাঁ! সফরে আমরা যখন খৃষ্টান পল্লীতে ঢুকে গীর্যা এবং মূর্তিপূজকদের উপাসনালয় অতিক্রম করছিলাম তখন খৃষ্টান এবং অগ্নীপূজকদেরকে গাইরুল্লাহর ইবাদত করতে দেখে আমার অন্তরে অহংকার এবং গর্ব পয়দা হল যে, আমরা মোমেন, একাত্ববাদে বিশ্বাসী আর এই কমবখতরা কত বড় জাহেল এবং আহমক যে, বোধহীন শক্তিহীন জিনিসের পূজা করে। ঠিক তখনই আমি একটি গায়েরী আওয়াজ শুনতে পেলাম তোমার ঈমান এবং একত্ববাদে বিশ্বাসে তোমার কোন হাত নেই। আমার দেওয়া তৌফিকেই তোমার এই সৌভাগ্য অর্জিত হয়েছে। তুমি কি তোমার ঈমানকে তোমার নিয়ন্ত্রনাধীন মনে করো? তাহলে তুমি দেখ, এখনই আমি তোমাকে বিষয়টি খোলাসা করে দিচ্ছি। আর ঐ সময়ই আমার

মেন হলো যেন আমার অন্তর থেকে একটি পাখি বের হয়ে উড়ে। মূলত এটিই ঈমান ছিল।

শায়েখের মুখে পুরা ঘটনা শুনার পর আমাদের কাফেলা আরো বিপুল খুশীর সাথে বাগদাদে গিয়ে পৌঁছলো। শায়েখের প্রত্যাবর্তনের খবর শুনে বাগাদাদের জনগণ খুশিতে মেতে উঠলো। হাজার হাজার মুরিদ দলে দলে শায়খের দরবারে ছুটে আসালো, বন্ধ খানকাহগুলো খুলে দেওয়া হলো। শায়েখ নিজেকে আরো বেশী তালীম তরবিয়ত, ওয়াজ, নসিহতের সাথে জড়িয়ে নিলেন। দরসে কোরআন, দরসে হাদিসও পুরোদ্যমে চালু হলো। আল্লাহ তায়ালা হযরতকে আগের তুলনায় আরো অনেক বেশী যোগ্যতা এবং কামালাত নসীব করলেন। এমন কি শায়েখের ছাত্র সংখ্যা চল্লিশ হাজারের ও বেশী ছাড়িয়ে গেল।

হযরত শিবলী বলেন, একদিন ফজরের নামাজের পর আমরা শায়েখের দরবারে বসে শায়েখের নসিহত শুনতে ছিলাম। হঠাৎ কে যেন খানকার দরজায় কড়া নাড়লো। আমি দরজার কাছে গিয়ে দেখি বোরকা পরিহিতা মহিলা দাঁড়িয়ে আছে। তাকে আমি তার পরিচয় এবং কোথায় থেকে এসেছে এবং কেন এসেছে জিজ্ঞাসা করলাম। প্রতি উত্তরে মহিলা বললো, তোমার শায়খকে বলো খৃষ্টান পল্লীতে যে মেয়েটিকে রেখে এসেছে সে আপনার দরবারে এসেছে। আমি শায়েখের কাছে গিয়ে ঘটনাটি বলার পর শায়েখের চেহারা বিবর্ণ হয়ে উঠল। তিনি কাঁপতে লাগলেন। অক্ষম হয়ে মহিলাকে আসার অনুমতি দিলেন। শায়েখকে দেখে মহিলা কান্নায় ভেঙ্গে পড়লো এবং বাকরুদ্ধ হয়ে পড়লো। মুখ থেকে কোন কথা বেরুচ্ছে না। এবার শায়েখ জিজ্ঞাসা করলেন তুমি এখানে কিভাবে আসলে? তখন মহিলা বাকরুদ্ধ কণ্ঠে বললো, হে শায়েখ! আপনার পল্লী থেকে বিদায় নেওয়ার খবর যখন আমি জানতে পারলাম তখন আমি চরম অস্থির হয়ে পড়েছিলাম। অস্থিরতা এত প্রকট ছিল যা আমি ছাড়া আর কেউ বলতে পরবে না। এমন কি পানাহার, ঘুম, আরাম-আয়েশ সবই উধাও হয়ে গিয়েছে। চেষ্টা করেও দু'চোখের পাতা এক করতে পারতাম না।

একদিন আমি শুয়েছিলাম শেষ রাতে হঠাৎ কিছুটা তন্দ্রাভাব আসতেই এক ব্যক্তিকে স্বপ্নে দেখি, সে আমাকে লক্ষ্য করে বলছে যদি ঈমানদার মহিলাদের অর্ন্তভুক্ত হতে চাও তাহলে মূর্তিপূজা ছাড় এবং তাওবা করে শায়খের ধর্মের অনুসরণ কর। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম শায়খের ধর্ম কোনটি? তিনি বললেন, ইসলাম। তিনি ইসলামের পূর্ণ পরিচয় পেশ করেন যা আমার মনপুত হয়। তাই আমি তাকে স্বপ্নে জিজ্ঞাসা করলাম, শায়খের দরবারে যাবো কিভাবে? তিনি আমাকে চোখ বন্ধ করে তার হাত ধরতে বললেন, আমি তাই করলাম। কিছুক্ষণ চলার পর তিনি আমাকে চোখ খুলতে বললেন, চোখ খুলে দেখি আমি দাজলা নদীর তীরে দাঁড়িয়ে আছি। যা দেখে আমি বেশ অবাক হয়ে যাই এবং বিস্ময়ের দৃষ্টিতে এ ব্যক্তির দিকে তাকিয়ে থাকি। এবং মনে মনে ভাবতে থাকি আমি ছিলাম কোথায় আসলাম কোথায়। তারপর ঐ ব্যক্তি আপনার কক্ষের দিকে ইশারা করে বলে এটিই শায়েখের কামরা।

তিনি বললেন, শায়েখকে বলবে আপনার ভাই খিজির আ. সা. সালাম জানিয়েছেন। আপনি আমাকে মুসলমান বানিয়ে নিন। শায়েখ মেয়েটিকে মুসলমান বানিয়ে পাশের নির্জন কামরাতে থাকার এবং ইবাদত বন্দেগীতে মশগুল থাকার হুকুম দিলেন। মেয়েটি সারাদিন রোযা রাখত এবং সারারাত বন্দিগিতে কাটিয়ে দিত। এভাবে অল্প সময়ের মধ্যে তৎকালীন বহু বুযুর্গ থেকে নিজেকে অনেক উর্দ্ধে নিয়ে যেতে সক্ষম হলো। কঠোর রিয়াজত মোজাহাদার কারণে তার শরীর এত দুর্বল হয়ে পড়েছে যে, অবশেষে সে মারাত্মক অসুস্থ হয়ে পড়লো যা তাকে মৃত্যুর কোলে নিয়ে গেল। জীবনের অন্তিম ইচ্ছা অনুযায়ী সে একটি বার শায়খকে দেখার আবদার করলো। শায়েখ মেয়েটির অবস্থা জানতে পেরে তার কাছে উপস্থিত হলো। মেয়েটি শায়েখের দিকে তাকতেই চোখ দুটি অশ্রুতে ছল ছল করতে লাগলো। দু'চোখের পানি গন্ডদেশ বেয়ে প্রবাহিত হতে লাগলো। খুব ভাঙ্গা কণ্ঠে শায়েখকে সালাম দিলো। শায়েখ সালামের জবাব দিয়ে বললেন, ঘাবড়িও না অতিসত্বর জান্নাতে সাক্ষাত হবে।

অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে মেয়েটি এই ধারাকে বিদায় জানিয়ে মাওলার ডাকে সাড়া দিয়ে পরেকালে পাড়ি দিলেন। হযরত শিবলী রহ. বললেন, এর অল্প কিছুদিন পর শায়েখও এই দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে পরকালের পথে পাড়ি জমালেন।

শায়েখের মৃত্যুর কিছুদিন পর আমি স্বপ্নে দেখি জান্নাতের এক মনোরম বাগানে শায়েখ অবস্থান করছেন। সত্তরজন হুরের সাথে শায়েখের বিবাহ হয় তার মধ্যে সর্বপ্রথম যার সাথে বিবাহ হয় তিনি হলেন ঐ মেয়েটি। তারা জান্নাতে চিরস্থায়ী শান্তির সাথে জীবন যাপন করছে।

(সূত্র) এই ঘটনাটি আমি সর্বপ্রথম ১৯৯৪ ইং সনে জামেয়া মুহাম্মাদীয়া মাদরাসায় জালালাইন শরীফ পড়াকালীন আমার জালালাইন প্রথম খণ্ডের উস্তাদ বর্তমানে মারকাজুদ দাওয়াতুল ইসলামীয়ার মুফতী আবুল হাসান আব্দুল্লাহ দা: বা: এর জবানে শুনেছি। পরবর্তিতে অনেক বিজ্ঞ উলামায়ে কেরামদের কাছ থেকে শুনেছি ঘটনাটি। শায়খুল হাদিস হযরত জাকারিয়া রহ. তাঁর কিতাব আপবিতি' এর মধ্যে বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন এবং উম্মুল আমরাজ এর ২৫-৩০ পৃষ্ঠায় ঘটনাটি বর্ণিত আছে। তাছাড়া সূফী ইকবাল সাহেব রহ. তার কিতাব আকাবেরকে সুলুক এবং হাকীম ইলিয়াস রহ. শায়েখে উন্দুলিসা এক আজীব আওর ইবারতনাক ওয়াকেয়া নামক রেছালায় বর্ণনা করেছেন।

কুকুর প্রভু ভক্তির এক আজীব ঘটনা

বাগাদাদের এক লোকের কুকুর পালার খুব শখ ছিল। তাই তার অনেকগুলো কুকুর ছিল। একবার লোকটি বিশেষ কাজে কোন এক গ্রামে রওয়ানা হলো। তার কুকুর ও তার পিছে পিছে রওয়ানা হলো। মালিক কুকুরটিকে অনেক বার তাড়িয়ে দিলো না আসার জন্য। কিন্তু কিছুতেই কুকুর তার পিছু ছাড়ল না। লোকটি যখন গ্রামে প্রবেশ করলো তখন কুকুরটি তার সঙ্গে ছিল। ঐ গ্রামের লোকদের সাথে কুকুরের মালিকের পূর্ব থেকেই দুশমনি ছিল। তাই তারা তাকে একা পেয়ে সুযোগ মনে করে একটি নির্জন

ঘরে নিয়ে গেল। কুকুরটিও তখন সাথে ছিলা গ্রামবাসীরা তাকে মেরে একটি শুকনা কুপে ফেলে দিয়ে উপরে একটি তক্তা দিয়ে তার উপর মাটি চাপা দিয়ে দিল। এবং কুকুরটিকে প্রহার করে ঘর থেকে তাড়িয়ে দিল।

কুকুরটি তাড়া খেয়ে মালিকের বাড়িতে এসে খুব জোরে জোরে ঘেউ ঘেউ করতে লাগলো। কিন্তু কুকুরের চিৎকার প্রতি কেউ ভ্রুক্ষেপ করলো না। এদিকে কুকুরের মালিকের মা তার সন্তানকে তালাশ করতে লাগলো। অনেক তালাশ করার পর তাকে না পেয়ে তার সন্তানকে কেউ মেরে ফেলেছে ভেবে নিরুপায় হয়ে চুপ হয়ে রইল এবং সন্তানের পালিত সব কুকুরগুলো বের করে দিল। কুকুরগুলো এ দিকে সে দিকে চলে গেল।

কিন্তু ঘটনার সাক্ষী কুকুরটি কিছুতেই মালিকের ঘর ছাড়ছে না। মালিকের মা কুকুরটি মানুষের সহযোগিতা ঘর থেকে বের করে ঘরের দরজা লাগিয়ে দিল। কিন্তু বেচারা কুকুর ঘরের দরজার কাছেই পড়ে রইল। মালিকের বাড়ির পাশ দিয়ে ঘটনাক্রমে মালিকের হত্যাকারিদের একজন যাচ্ছিল তৎক্ষানাৎ কুকুরটি এ লোককে চেনে ফেললো এবং কাপড় কামড়ে ধরে খুব ঘেউ ঘেউ করতে লাগলো। এমন কি আশপাশের বহু লোক একত্রিত হল। এবং সকলে মিলে চেষ্টা করলো, যেন কুকুর লোকটির কাপড় ছেড়ে দেয় কিন্তু কিছুতেই কুকুর কাপড় ছাড়লো না।

এদিকে মালিকের মা কুকুরের ঘেউ ঘেউ ও মানুষের হৈ চৈ শুনে ঘর থেকে বের হল। তিনি দেখলেন তার ছেলের কুকুর একটি লোকের কাপড় কামড়ে ধরে রেখেছে তখন তিনি আরো কাছে গিয়ে লোকটিকে দেখেই চেনে ফেলল যে, লোকটি আমার ছেলের দুশমন। সে সবসময় আমর ছেলের তালাশে থাকতো। নিশ্চয় এই আমার ছেলেকে হত্যা করেছে, এ বলে সে লোকটিকে ঝাপটিয়ে ধরলো। পুলিশ খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হলো। যখন পুলিশ এই অবস্থা দেখলো তখন বললো, নিশ্চয় কিছু একটি ঘটেছে। তাই পুলিশ কুকুর এবং লোকটিকে খলিফা রাজী বিল্লাহ এর নিকট নিয়ে গেল। এবং নিহতের মা বিচার দায়ের করলো।

খলিফা রাজী বিল্লাহ তাকে অনেক জেরা করলো। কিন্তু সে কিছুতেই অপরাধের কথা স্বীকার করলো না। অবশেষে খলিফা তাকে জেলে প্রেরণ করলো। কুকুরটি জেলখানার গেটে বসে থাকলো। অনেক দিন পর যখন লোকটি মুক্তি পেয়ে জেলখানার বাইরে আসলো, সাথে সাথেই কুকুর আবার তাকে কামড়ে ধরলো। লোকেরা ছাড়ানোর যথাসাধ্য চেষ্টা করলো। কিন্তু কুকুর কিছুতেই তাকে ছাড়ালো না। সুতরাং ঘটনাটি আবার খলিফাকে জানানো হলো, এবার খলিফা তার এক গোলামকে নির্দেশ দিলো অপরাধী ও কুকুরটিকে ছেড়ে দেওয়া হবে তুমি উভয়ের পিছে পিছে যাবে। যখন লোকটি ঘরে ঢুকবে তুমিও কুকুরটির সাথে ঘরে ঢুকে যাবে। তারপর দেখবে আসল ঘটনা কি। যা দেখ সাথে সাথে আমাকে জানাবে।

গোলাম খলিফার নির্দেশ অনুযায়ী উভয়ের পিছে পিছে চললো। লোকটি যখন ঘরে ঢুকলো তারপর গোলাম এবং কুকুর ঘরে ঢুকলো। কিন্তু গোলাম পুরা ঘর তালাশ করে অপ্রীতিকর কিছুই পেল না। কিন্তু কুকুরের অবস্থা ছিল যে, সে সারাক্ষণ ঘেউ ঘেউ করতে ছিল এবং কুপের জায়গায় পা দিয়ে আছড়াতে ছিল। গোলাম কুকুরের এ আচরণ গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করে পেরেশান হয়ে ঘটনাটি খলিফাকে জানালো। খলিফা ঐ স্থানকে খনন করার নির্দেশ দিলেন। খলিফার নির্দেশ অনুযায়ী কিছুক্ষণ খনন করার পর একটি কুপ দেখতে পেল। অত:পর সে কুপ থেকে নিহতের লাশ বের করার সাথে সাথে লোকটিকে গ্রেফতার করা হলো এবং অনেক শাস্তি দেয়ার পর সে ঘটনা স্বীকার করলো। ঘটনার সাথে জড়িতদের নাম বলে দিল। লোকটিকে শাস্তি হিসেবে হত্যা করা হলো। বাকী আসামীরা বিপদ আঁচ করতে পেরে অজানা উদ্দেশ্যে পালিয়ে গেল। (হায়াতুল হায়ওয়ান, খ.৩, পৃ.৩৩৬-৩৭)

কুকুর একটি প্রাণী তা সত্বেও মালিকের প্রতি রয়েছে তার চরম ভালবাসা, প্রভু ভক্তিতে কুকুরের জুড়ি নেই বললেই চলে। অথচ মানুষ সর্বশ্রেষ্ঠ মাখলুক এবং জ্ঞানী জাতি আল্লাহর নাফরমানী করে চলছে। একটি কুকুর থেকেও মানুষ প্রভু ভক্তির শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। কুকুরের মাঝে এমন কিছু গুণ আল্লাহ পাক রেখেছেন যার প্রতিটির মধ্যে মানুষের জন্য শিক্ষা রয়েছে।

কুকুরের ভাল গুণ কি কি?

হযরত হাসান বছরী রা. বলেন, কুকুরে মধ্যে এমন দশটি স্বভাব রয়েছে যা প্রতিটি মুমিনের মধ্যেই থাকা উচিত। কুকুরের সেই উত্তম স্বভাবগুলো হলো এই,

১. কুকুর অনাহার থাকে যা সালেহীন বা নেককারদের বৈশিষ্ট্য।

২. কুকুরের কোন ঘরবাড়ি নাই। যা মুতাওয়াক্কিলীন বা আল্লাহর উপর ভরসাকারীদের নির্দশন।

৩. কুকুর রাতে কম ঘুমায় যা মুহিব্বীন বা আল্লাহ প্রেমিকের গুণ।

৪. কুকুরের মৃত্যু হলে সে কোন মিরাছ রেখে যায় না। যা হলো, যাহেদগণের বৈশিষ্ট্য।

৫. কুকুর কখনো তার মালিককে ছেড়ে যায় না যা সত্যিকারও যর্থাথ সাধকদের বৈশিষ্ট্য।

৬. কুকুর সংকীর্ণ জায়গাতেই সন্তুষ্ট থাকে যা বিনয়ীদের বৈশিষ্ট।

৭. কেউ যখন কুকুরকে থাকার জায়গা থেকে তাড়িয়ে দেয় তখন সে এটাকে উচ্ছেদকারীর জন্য ছেড়ে দেয়। যা রাযীন বা আল্লাহর প্রতি রাযী ও সন্তুষ্টবানদের বৈশিষ্ট্য।

৮. কুকুরকে যদি তার মনিব প্রহার করার ডাক দেয় তবে তৎক্ষনাৎ সে তার মনিবের ডাকে সাড়া দেয়। যা আল্লাহর প্রতি পরম নিবিষ্ট ও একাগ্রচিত্ত লোকদের বৈশিষ্ট্য।

৯. মনিব যখন আহার করে কুকুর তখন দূরে বসে অপেক্ষা করে। যা মিসকীনদের আলামত বা নিদর্শন।

১০.কুকুর যখন কোন বাড়ি থেকে চলে যায় তখন সে আর এদিকে ভ্রুক্ষেপ করে না। যা চিন্তাশীলদের আলামাত। আল্লাহ আমাদেরকে উত্তম গুণাবলী অর্জনের তৌফিক দান করুন, আমিন।

তার প্রেমিক আমাকে মেরেছে, আমার প্রেমিক তাকে মেরেছে

একবার পাকিস্তনের একটি জামাতের সাথে আমার কিছুক্ষণ সময় কাটানোর সৌভাগ্য হয়েছিল। তন্মধ্যে একজন বিজ্ঞ সাথী ছিলেন ইসমাইল শহিদ-এর শাহাদাতের স্থান ঐতিহাসিক বালাকোটের বাসিন্দা।

ঘটনাটি তিনি আমাদেরকে শুনায়েছেন। একবার এক প্রেমিক যুগল রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল। অপর দিক থেকে আসছিল এক বুর্যুগ। উভয়ে পাশাপাশি যাওয়ার সময় বুযুর্গের পায়ের ছিটায় কিছুটা কাঁদা প্রেমিকের কাপড়ে লেগে যায়। তাতেই সে ক্ষিপ্ত হয়ে বুযুর্গকে অশালীন গালিগালাজ ও প্রহার করে। এর কিছুক্ষণ পরেই ঐ প্রেমিক চিৎকার করতে থাকে এবং প্যারলাইসেস আক্রান্ত হয়ে পড়ে। প্রেমিকা চিৎকার করে বলতে থাকে ঐ লোকটি আমার স্বামীকে মেরে ফেলেছে। লোকজন ঘটনাস্থলে জড়ো হলো এবং তারা বুযুর্গ-এর কাছে পূর্ণ ঘটনাটি জানতে চাইলো। বুর্যুগ বললো, আসলে ঘটনাটি হলো আমি রাস্তার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম। আমার পায়ের থেকে কাঁদা ছিটে মেয়েটির কাপড়ে লেগেছিল। মেয়েটি তার প্রেমিকের কাছে সাহায্য চেয়েছে। ফলে তার প্রেমিক আমাকে প্রহার করেছে আমিও আমার প্রেমিক আল্লাহ তায়ালার কাছে সাহায্য চেয়েছি। ফলে আমার প্রভু ও তাকে মেরেছেন।

অতএব, আমার করার কিছুই নেই। ইহা হলো আল্লাহ ওয়ালাদের সাথে বেআদবী করার পরিণাম। স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা বলেন, যে আমার ওলীদের সাথে শত্রুতা করবে আমি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলাম।

অথচ বর্তমানে যুগে আল্লাহওয়ালাদের সাথে চরম বেআদবী করা হয়। তাদের সাথে উপহাস করা হয়। তাদেরকে অপমান করার জন্য নানাভাবে চেষ্টা করা হয়। মনে রাখতে হবে তাদের সাথে শত্রুতা করা আল্লাহর সাথে যুদ্ধ করার শামিল। অতএব, আসুন আল্লাহ ওয়ালাদের সাথে ভাল ব্যবহার করি, তাদেরকে সম্মান করি।

বালআম বিন বা'উরার ঘটনা

হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রা. থেকে বিশ্বস্ত সূত্রে বর্ণিত। বনী ইসরাঈলে একজন অনুস্বরণীয় আলেম ছিল। যার নাম ছিল নির্ভরযোগ্য সূত্র অনুযায়ী বালআম বিন বা'উরা। সে বায়তুল মুকাদ্দাসের নিকটবর্তী কেনআন এলাকার অধিবাসী ছিল।

অন্য বর্ণনামতে বণী ইসরাঈল সম্প্রদায়ের ছিলেন। ফেরআউন সমুদ্রে ডুবে মরা ও মিসর বিজয়ের পর যখন মুসা আ. ও তাঁর সম্প্রদায় বনী ইসরাঈলীদেরকে জাব্বারীন সম্প্রদায় তথা কাউমে আমালিকার বিরুদ্ধে জিহাদ করার হুকুম করেন, তখন জাব্বারীন সম্প্রদায় মুসা আ. ও বনী ইসরাঈলের জিহাদের প্রস্তুতির কথা শুনে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়লো।

তারা সবাই মিলে বালআম ইবনে বা'উরার কাছে গিয়ে সবিনয় বললো, মুসা আ. একজন কঠিন লোক। তাছাড়া বিপুল সংখ্যক লোকজনও রয়েছে তার সাথে। তারা এসেছে আমাদেরকে আমাদের দেশ থেকে বের করে দেওয়ার জন্য। আপনি দয়া করে আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করে তাদেরকে আমাদের মোকাবেলা করা থেকে ফিরিয়ে দিন।

বালাম ইবনে বাউরা ইসমে আজম জানতো এবং সেই ইসমে আজমের মাধ্যমে দোয় করলে দোয়া কবুল হত। প্রতি উত্তরে বালআম বললো,অতিপরিতাপের বিষয় তোমরা একি বলছো? তিনি হলেন আল্লাহর নবী?! তার সাথে রয়েছে অগণিত ফেরেশতা। আল্লাহর দরবারে তার পদ মর্যাদা সম্পর্কেও আমি জানি। আমি তার বিরুদ্ধে কেমন করে বদদোয়া করতে পারি। অতএব, আমি যদি এরুপ কাজ করি তাহলে আমার দুনিয়া ও আখেরাত উভয়টাই বরবাদ হয়ে যাবে।

সমাজের প্রভাবশালীরা যখন পীড়াপিড়ি করতে থাকলো তখন বালআম বললো, আমি আল্লাহর দরবারে জেনে নেই যে, এ ব্যাপারে দোয়া করার অনুমতি আছে কি না? সে তার নিয়ম অনুযায়ি ইস্তেখারা কিংবা অন্য কোন আমল করলো। তাতে তাকে স্বপ্নে বলে দেওয়া হলো সে যেন এ ধরণের কাজ কখনো না করে। সে সম্প্রদায়কে বললো, আমাকে এ ধরণের দোয়া করতে নিষেধ করা হয়েছে। তারা বালআমকে একটি লোভনিয় উপঢৌকন

দিল যা মূলত ঘুষ। সে যখন সেই উপঢৌকন গ্রহণ করল তখন সম্প্রদায়ের লোক তার পিছনে লেগে গেল যে আপনি যেভাবে হোক এ কাজটি করে দিন। তাদের কাকুতী মিনতী, অনুরোধ, অনুনয়ন, বিননয়, পীড়াপীড়ির কোন অন্ত ছিল না। বর্ণনা মতে বালআমের বিবি ও উৎকোচ গ্রহণ করে তাদের কাজটি করে দেওয়ার পরামর্শ দেয়।

সে স্বীয় স্ত্রীর সন্তুষ্টি কামনা এবং মালের মোহে অন্ধ হয়ে গেল। ফলে সে মুসা আ. ও বনী ইসরাইলের বিরুদ্ধে বদদোয়া করতে শুরু করলো। সে মুসা আ. ও তাঁর জাতীর বিরুদ্ধে যেসব বাক্য বলতে চাইলো সে সব বদদোয়া জাব্বারীন সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে উচ্চারিত হয়ে যাচ্ছিল এবং হযরত মুসা আ. এর বিরুদ্ধে একটি বদদোয়াও তার মুখ হতে বের হচ্ছিল না। ফলে জাব্বারীন সম্প্রদায় ভীত হয়ে চিৎকার করে বললো, তুমি যে আমাদের জন্য বদদোয়া করছো! বালআম বললো, আমি কি করবো আমার জিহ্বা আমার ইচ্ছার বাহিরে চলে গিয়েছে। এটা আমার ইচ্ছাকৃত নয়, আমার জিহ্বা মুসা আ. এর বিরুদ্ধাচারণে সমর্থ নয়। ফল দাঁড়ালো এই যে, এ সম্প্রদায়ের উপর গযব নাজিল হল। আর বালআমের শাস্তি হল তার জিহ্বা বেরিয়ে এসে বুকের লটকে পড়ল। এই আজাবের আলোচনা আল্লাহ পাক কোরাআনে এভাবে বর্ণনা করেছেন,

فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَث

অর্থাৎ তার অবস্থা হলো কুকুরের ন্যায়। যদি তাকে তাড়া কর তবুও সে হাঁপাবে আর যদি ছেড়ে দাও তবুও সে হাঁপাবে।

এরপর সে সম্প্রদায়কে বললো, এবার তো আমার দুনিয়া ও আখেরাত সবই বরবাদ হয়ে গেল। আমার দোয়াও কবুল হচ্ছে না, তবে তোমাদের এক কৌশল শিখিয়ে দিচ্ছি, যার দ্বারা তোমরা মুসা আ. এর বিরুদ্ধে বিজয়ী হতে পারবে। তা হলো তোমরা তোমাদের সুন্দরী নারীদেরকে সাজিয়ে বনী ইসলাঈলের সৈন্যদের নিকট পাঠিয়ে দাও। এবং তাদেরকে এ কথা বুঝিয়ে দাও বনি ইসরাঈলের লোকেরা যদি তাদের সাথে কিছু করতে চায় তারা যেন করতে দেয়। কোন রকমের বাধা যেন না দেয়। এরা মুসাফির। দীর্ঘদিন ঘর

ছাড়া। এই তদবীরে তারা হারাম কাজে লিপ্ত হয়ে পড়বে, তাহলে তাদের উপর আল্লাহ তাআলার আজাব নাযিল হবে এবং তারা কখনো বিজয়ি হতে পারবে না।

বালআমের এ শয়তানী বুদ্ধি তাদের বেশ পছন্দ হলো এবং সেমতে কাজ করলো। বণী ইসরাঈলের জনৈক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি এ ষড়যন্ত্রের কবলে পড়লো। মুসা আ. তাকে অনেকবার নিষেধ করলেন কিন্তু সে বিরত থাকল না। ফলে বনি ইসরাঈলের মাঝে কঠিন প্লেগ রোগ ছড়িয়ে পড়লো। তাতে একই দিনে সত্তর হাজার ইসরাঈলী মারা গেল। এমন কি যেব্যক্তি ব্যভিচারে লিপ্ত হয়েছিল তাকে বনী ইসরাঈলীরা হত্যা করে প্রকাশ্যে টাঙ্গিয়ে রাখল যাতে অন্যান্যরা শিক্ষা গ্রহণ করে। তারা সবাই যখন তওবা করল তখন সে প্লেগ দমিত হলো। (সুত্রঃ রুহ কি বিমারিয়া আওর উনকা এলাজ২৪-৬)

বর্ণিত আছে কিয়ামতের দিন আসাহাবে কাহাফের কুকুর বালআম ইবনে বা'উরার সূরতে জান্নাতে যাবে আর বালআম কুকুরের সুরতে জাহান্নামে যাবে।

ফায়দা : ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় অতীতে মুসলমানদের অনেক যুদ্ধে পরাজিত হওয়ার কতগুলো কারণ ছিল। তার মধ্যে নারী কেলেংকারী ছিল অন্যতম। এমন কি পশ্চিমা বিশ্ব মুসলমানদেরকে পরাস্ত করার জন্য যতগুলো কৌশল অবলম্বন করেছিল তার মধ্যে নারী ছিল অন্যতম কৌশল। এমন কি সালাহ উদ্দিন আইয়ূবিকে পরাজিত করার জন্য পশ্চিমারা একজন রূপসী নারী ব্যবহার করেছিল। যাকে আল্লাহ ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় দিয়ে তাদের সে চক্রান্ত নস্যাত করেছেন।

আমার অপরাধ একটি আপনার অপরাধ কয়েকটি

একদিন হযরত উমর রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু মদিনায় ঘুরে ঘুরে মানুষের অবস্থা দেখছিলেন। পথিমধ্যে দেখতে পেলেন এক বৃদ্ধকে তার দাস শরাব পান করাচ্ছে। হযরত উমর রা. এই দৃশ্য দেখে তৎখনাৎ বেড়া ফাঁক করে ঘরে প্রবেশ করলেন। তখন বৃদ্ধ লোকটি বলল, জনাব, আমি একটি

অপরাধ করেছি, আর আপনি কয়েকটি অপরাধ করছেন। ১. কারো ঘরে অনুমতি ছাড়া প্রবেশ করা নিষেধ, আপনি অনুমতি ছাড়া প্রবেশ করেছেন, ২. সালাম দিতে বলা হয়েছে কিন্তু আপনি তা করেননি। ৩. দরজা দিয়ে প্রবেশ করতো বলা হয়েছে কিন্তু আপনি ঘরের বেড়া ফাঁক করে এসেছেন। ৪. দোষ তালাশ করতে নিষেধ করা সত্বেও আপনি দোষ তালাশ করেছেন।

এ কথা শুনে উমর রা. কাঁদতে কাঁদতে সেখান থেকে ফিরে আসলেন। কিছুদিন পর ঐ বৃদ্ধ লোকটি হযরত উমর রা. দরবারে এসে গোপনে বললেন, হুজুর! আমি ঐ দিন থেকে শরাব পান করা ছেড়ে দিয়েছি।

(তাবলীগের আমীর হযরত মাওঃ মুফতী ইউসুফ রাহ. এর বয়ান থেকে সংগৃহীত)

সব সমাস্যার এক সমাধান

বর্ণিত আছে কোন এক ব্যক্তি হযরত হাসান বসরী রাহ. এর দরবারে এসে দুর্ভিক্ষের অভিযোগ করলো। জবাবে হাসান বসরী রাহ. বললেন, ইস্তেগফার করুন। আরেকজন এসে হযরতের কাছে অভাব অনটনের অভিযোগ করলো হযরত তাকেও বলল, ইস্তেগফার করুন। ইতোমধ্যে তৃতীয় এক ব্যক্তি এসে বললো, হযরত, আমার কোন সন্তান হচ্ছে না আমাকে দয়া করে একটা তদবীর বলে দিন। হযরত তাকেও বললেন, ইস্তেগফার করুন।

চার ব্যক্তি চার প্রকারের অভিযোগ পেশ করলো আর প্রত্যেকেই হযরত ইস্তেগফার পড়তে বললেন। অর্থাৎ অভিযোগ চারটি ঔষধ মাত্র একটি।

কেউ হযরতকে জিজ্ঞাসা করলেন, হযরত! আপনার খেদমতে চারজন লোক চার প্রকারের অভিযোগ নিয়ে এসেছে আর আপনি প্রত্যেক অভিযোগের জবাবে একই ঔষধ দিয়েছেন। অর্থাৎ ইস্তেগফার করতে বলেছেন ইহার কারণ কি?

প্রতি উত্তরে হযরত বললেন, এই চার অভিযোগের একই ঔষধ আল্লাহ পাক কোরআন পাকে বলে দিয়েছেন। এই বলে হযরত হাসান বসরী রাহ. সূরায়ে নুহের ১০ নং আয়াত থেকে ১২ নং আয়াত পর্যন্ত তেলাওয়াত করলেন।

اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا (٠) يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا ()
وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَارًا

অর্থাৎ, তোমরা তোমাদের পালনর্কতার কাছে ইস্তেগফার কর। তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল। তিনি তোমাদের উপর অজস্র বৃষ্টি ধারা ছেড়ে দিবেন। তোমাদের ধন সম্পদ ও সন্তান সন্ততি বাড়িয়ে দিবনে। তোমাদের জন্য উদ্যান স্থাপন করবেন এবং তোমাদের জন্য নদী নালা প্রবাহিত করবেন।

(সূত্রঃ রুহু কি বিমারিয়া আওর উনকা এলাজ পৃঃ ৩৩)

ফায়দা : বর্ণিত আয়াতগুলির মধ্যেই ইস্তেগফারের দ্বারা সবগুলো সমস্যার নিরসনের বর্ণনা রয়েছে। এতে স্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে ইস্তেগফার কত বড় কার্যকরি আমল যার দ্বারা শুধু গোনাহই মাফ হয় না বরং; ইস্তেগফারের মধ্যে মানুষের যাবতীয় মৌলিক সমস্যার সমাধানও রয়েছে। সাহাবায়ে কেরাম খোদা প্রদত্ত সন্তুষ্টির সার্টিফিকেট পেয়েও দৈনিক হাজার বার ইস্তেগফার করতেন।

হযরত রাসূলে করিম সা. এর সব গোনাহ মাফ হওয়া সত্ত্বেও হুজুর সা. সব সময় ইস্তেগফার করতেন? তাই আসুন, নিজের গোনাহের জন্য এবং যাবতীয় সমস্যার সমাধানের জন্য বেশী বেশী ইস্তেগফার করি। আল্লাহ আমাদেরকে তৌফিক দান করুন। (আমিন)

লাশ পরিবর্তন

মদিনা শরীফে কোন এক আলেমের মৃত্যু হল এবং যথারীতি তাকে দাফন করা হল। পরবর্তীতে কোন এক কারণে ঐ আলেমের কবরটি খননের প্রয়োজন দেখা দিল। লোকজন কবরটি খুড়তেই দেখে সেখানে ঐ আলেমের লাশ নেই। তাতে একজন খৃষ্টান নারীর লাশ রয়েছে। উপস্থিত লোকদের অনেকেই মেয়েটিকে চেনতো যে সে পার্শ্ববর্তী শহরের এক খৃষ্টানের মেয়ে। তাই লোকেরা মেয়ের পরিবারের কাছে গিয়ে পূর্ণ ঘটনা বর্ণনা করল এবং মেয়েটির কবর খননের অনুমতি চাইল। কবর খননের পর দেখা গেল তথায় আলেমের লাশ পড়ে আছে। যাকে মদিনায় দাফন করা হয়েছিল।

লোকেরা চিন্তা করতে লাগলো। মদিনার আলেমের কবরে খৃষ্টান মেয়ের লাশ আর খৃষ্টান মেয়ের কবরে আলেমের লাশের কারণ কি?

তখন লোকরো খৃষ্টান মেয়ের পরিবারকে তার আমল সর্ম্পকে জিজ্ঞাসা করলো। তখন তারা বলল, মেয়েটি সবসময় বলতো, ইসলামই উত্তম ধর্ম। অর্থাৎ সে মনে প্রাণে মুসলমান ছিল এবং মদিনায় ইন্তেকাল করার আকাংখা করতো। এই জন্যই আল্লাহ তায়ালা মেয়ের লাশকে মদিনায় পৌঁছিয়ে দিলেন। এদিকে আলেমের স্ত্রীকে তার আমল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে সে উত্তরে বলল, যে, আমার স্বামী খুব নেককার ছিল। কিন্তু একটি ব্যাপারে সে বলতো, এই হুকুমটি খৃষ্টান ধর্মে অনেক সহজ করা হয়েছে। তাদের ধর্মে ফরজ গোসলের কোন প্রয়োজন নাই। যেহেতু সে এক্ষেত্রে খৃষ্টান ধর্মকে পছন্দ করতো তাই তার লাশ খৃষ্টান পল্লীতে পৌঁছিয়ে দেওয়া হয়েছে।

প্রিয় পাঠক! মাত্র একটি বিষয়ে খৃষ্টান ধর্মকে প্রাধান্য দেওয়ার কারণে তার লাশ খৃষ্টান পল্লীতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।

অথচ আজ আমাদের সমাজে এমন বহু লোক আছে যারা নামাজ রোজা সবই করে, কিন্তু ইসলামের কিছু কিছু ব্যাপারে সরাসরি বলেই ফেলে যে, এই ব্যাপারে খৃষ্টান ধর্মটা আমার কাছে ভাল লাগে বা এ ব্যাপারে হিন্দু ধর্ম অনেক উদার । তাদের পরিণতি কি হতে পারে তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

ইসলাম সর্বশেষ, র্সবশ্রেষ্ঠও মানব জাতীর জন্য কিয়ামত পর্যন্ত একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। সে ক্ষেত্রে অন্য ধর্মের কোন বিষয়কে পছন্দ করা বা প্রাধান্য দেওয়ার অর্থই হবে ইসলামের পূর্ণঙ্গতা নিয়ে সন্দেহ পোষণ করা, যা কিছুতেই গ্রহণযোগ্য নয়।

একবার হযরত উমর রা. এর নিকট ইঞ্জিলের কিছু বিষয় ভাল লাগল। তিনি বিষয়গুলো রাসূল সা.এর খেদমতে শুনাতে চাইলেন। রাসূল সা. রাগান্বিত হয়ে বললেন, উমর, তুমি কি এখন ধোকায় পড়ে আছ?

উক্ত ঘটনা থেকে বুঝা যায় ইসলাম ধর্ম মুসলমানদের অন্য কোন ধর্মের প্রতি আকর্ষণই থাকতে পারে না। পরিশেষে একটি হাদীস দ্বারা শেষ করছি,

নবী সা. বলেছেন, من تشبه بقوم فهو منهم অর্থাৎ, যার সাথে যার মহব্বত, তার সাথে তার কিয়ামত।

একেই বলে আশেকে রাসূল

আমাদের মসজিদে বহুদিন আগে সাহারানপুরের একটি জামাত এসেছিল। জামাতের প্রায় তরজমা আমাকে করতে হয়েছিল। জামাতের একজন নির্ভরযোগ্য সাথী একবার মাগরীবের পর বয়ান করলেন। বয়ানের মধ্যে তিনি রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাতের আলোচনা করতে গিয়ে একটি চমৎকার ঘটনা বর্ণনা করেছিলেন। যাতে রয়েছে উম্মতের জন্য বিশাল সবক। তিনি বলেন,

একবার হযরত আব্দুল কাদের জিলানী রহ. পাগড়ী পরিহিত অবস্থায় কোন এক প্রয়োজনে বাজারে রওয়ানা হলেন। সাথে হযরতের অনেক মুরিদানও ছিল। কিন্তু বাজারে গিয়ে কোন প্রয়োজনে পুরা না করেই হযরত খুব পেরেশান হয়ে তড়িগড়ি বাড়ি ফিরে এলেন। মুরিদরা কিছুই বুঝতে পারলেন না।

হযরত বাড়িতে ফিরেই পাগড়ী খুললেন, অত:পর টুপি খুলে মাথা থেকে একটা বিষাক্ত পোকা ঝেড়ে ফেলে দিলেন। মুরীদরা জিজ্ঞাসা করলো,হযরত আপনি বাজারে গেলেন কিন্তু কোন প্রয়োজন পুরা না করে তড়িগড়ি বাসায় ফিরে আসার কারণ কি? উত্তরে হযরত বললেন, আমার মাথায় একটি বিষাক্ত পোকা দংশন কতে ছিল তাই পোকাটি বের করার জন্য বাসায় এসেছি।

মুরীদরা বললো, হযরত! এই কাজতো আপনি বাজারেও করতে পারতেন। এর জন্য বাড়িতে আসার কি প্রয়োজন ছিল? জবাবে হযরত বললেন, পোকাটি যখন আমার মাথায় দংশন করছিল তখন আমি চিন্তা করছিলাম যে রাসূল সা. পাগড়ী পরিধান করে বাজারে গিয়েছেন, কিন্তু বাজারে হুজুর সা. পাগড়ী খুলেছেন কিনা তা আমার জানা নেই। (অন্য বর্ণনাতে আছে খুলেননি) তাই বাজারে পাগড়ী খুললে রাসূলের সুন্নাতের খেলাফ হয়ে যাবে এই ভয়ে আমি বাজারে না খুলে বাড়িতে গিয়ে খুলছি। ইহাই ছিল বুযুর্গানে কেরামের সুন্নাতের প্রতি ভালবাসা।

আজ তো আব্দুল কাদের জিলানী রহ.-এর ভক্তের অভাব নেই। বিভিন্ন জায়গাতে গাউসুল আজমের সাইনবোর্ড লাগিয়ে খানকাহ খুলে চলছে পীর মুরীদের রমরমা ব্যবসা। কিন্তু পীর মুরীদ কেউই সুন্নাতের অনুসারী নয়। অথচ নিজেকে দাবি করে আশেকে রাসূল। কিন্তু মাথা থেকে পা পর্যন্ত আশেকে রাসূলের কোন নিদর্শন নেই, আছে শুধু দেওয়ালের মধ্যে এবং পোষ্টেরের মধ্যে। এরা প্রকৃত আশেকে রাসূল নয়। তাই আসুন আব্দুল কাদের জিলানী এর মত আশেকে রাসূল হওয়ার চেষ্টা করি।

হযরত আদম আ.-এর ৫টি উপদেশ

হযরত আদম আ. তাঁর পুত্র হযরত শীস আ. কে পাঁচটি মূল্যবান নসিহত করে বলেছিলেন, তোমার বংশধরের নিকটও এই নসিহতগুলো পৌঁছে দিবে।

১. এ দুনিয়ার কখনও স্থায়ীভাবে থাকার চিন্তা করবে না। আমি বেহেশতে নিরাপদে ছিলাম। কেননা বেহেশত স্থায়ীভাবে থাকার জায়গা ছিল। কিন্তু একটি ভুলের কারণে আমাকে সেখান থেকে বের করে দুনিয়াতে পাঠিয়ে দিলেন।

২. তোমার স্ত্রীর খাহেশ অনুযায়ি কোন কাজ করবে না। আমি আমার স্ত্রীর খাহেশ মাফিক কাজ করেছিলাম। তার কথায় নিষিদ্ধ ফল খেয়েছিলাম। ফলে আমাকে কঠিন মসিবত সহ্য করতে হয়েছে। আমাকে জান্নাতের মত নিরাপদ ও শান্তিময় জায়গা থেকে বের করে দিয়েছেন।

৩. কোন কাজ করার পূর্বে খুব চিন্তা ভাবনা করবে। চিন্তা ভাবনা ছাড়া কোন কাজই করবে না। আমি যদি উক্ত নিষিদ্ধ ফল খাওয়ার পূর্বে এর পরিণতি সম্পর্কে সামান্যও চিন্তা-ফিকির করতাম তবে আমি এত কঠিন মসিবতে পড়তাম না।

৪. মনের মাঝে সন্দেহ আসে বা ধাক্কা লাগে এমন কাজ কখনও করো না। কেননা গাছের ফল খাওয়ার সময় আমার মনে সন্দেহ লেগেছিল। আমার মন বিচলিত ছিল। তারপরেও একটু চিন্তা করিনি, ফলে আমাকে আফসোস করতে হয়েছে।

৫. বিশেষ কাজে পরামর্শ করবে। পরামর্শ ছাড়া করবে না। কেননা আমি যদি ঐ নিষিদ্ধ ফল খাওয়ার পূর্বে ফেরেশতাদের সাথে পরামর্শ করতাম তবে আমার এই করুণ অবস্থা হত না।

(সূত্রঃ তাবলীগী মুরুব্বীদের বয়ান থেকে সংগৃহীত)

আদি পিতা আদম আ. এর সবগুলো নসিহতই আমাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই পালনীয়। আজ তো মানুষ দুনিয়া কামানোর জন্য পাগলা ঘোড়ার মত ছুটছি। এমন কি অর্থের নেশায় ঠিকমত ঘুমও যেতে পারছি না।

আর স্ত্রীর কথা ছাড়া নড়েও না চড়েও না সমাজেও এমন স্বামীরও অভাব নাই। চিন্তা ভাবনা করে কাজ করার মত লোকের অভাব দাঁড়িয়েছে। এতে যার সাথে পরামর্শ করবো তাকে বড় মনে হবে আর নিজেকে ছোট মনে হবে যা প্যাষ্টিজের ব্যাপারও বটে। আর সন্দেহযুক্ত কাজ করা তো আমাদের নিত্যদিনের স্বভাব হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই আসুন, আমাদের পিতা আদম আ. তার জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকে আমাদেরকে যে উপদেশ দিয়েছেন তা অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলি।

দুই জাহান্নামীর কান্ড

বর্ণিত আছে জাহান্নামে প্রবেশকারী দুই ব্যক্তি ভীষণভাবে চিৎকার করতে থাকবে। মহান পরওয়ারদিগার বলবেন, যাও, দুইজনকে বের করে নিয়ে আস। যখন তাদেরকে বের করে আনা হবে তখন তিনি তাদেরকে বলবেন, এত চিৎকার করছিলে কেন? তারা বলবে, আপনার রহমত পেতে আমরা এরূপ করেছিলাম। তিনি বলবেন, তোমাদের জন্য আমার রহমত হল তোমরা দোযখের যেখানে ছিলে সেখানে চলে যাও। একথা শুনার সাথে সাথে একজন দৌড়ে গিয়ে নিজেকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে, আল্লাহ তার জন্য জাহান্নামকে শান্তিদায়ক বানিয়ে দিবেন।

অপরজন আস্তে আস্তে যাবে আর পিছনে বারবার ফিরে তাকাবে। তখন আল্লাহ তায়ালা উভয়কে ডাকবেন এবং উভয়কে জিজ্ঞাসা করবেন তুমি দৌড়ে জাহান্নামে পড়লে কেন? আর তুমি দৌড়ালে না কেন? একজন উত্তরে

বলবে, আয় আল্লাহ, আমি দুনিয়াতে আমার কৃত নাফরমানি ও অবাধ্যতার প্রতি খেয়াল করে লজ্জা পেয়েছি তাই আজ আপনার হুকুম অতি তাড়াতাড়ি পুরা করার জন্যই দৌড়ে জাহান্নামে পড়েছি। অপরজন বলবে ওগো আল্লাহ! আমি দুনিয়াতে আপনার রহমতের কথা বহুবার শুনেছি তাই আপনার রহমতের দিকে ঘাড় ফিরিয়ে দেখছিলাম এবং আমার আশা ছিল আপনি আমাকে জাহান্নাম থেকে বের করার পরে পুনরায় তাতে দিবেন না। তখন আল্লাহ তায়ালা হুকুম দিবেন যাও, তোমরা উভায় বেহেশতে চলে যাও।

(সূত্র : বুখারী, তিরমিজী)

আল্লাহ তায়ালা কত বড় দয়ালু তা উক্ত ঘটনা দ্বারা বুঝা যায়। আল্লাহ মাফ করে দিবেন এই আশায় আল্লাহর হুকুম লংঘন করা, গোমরাহিতে লিপ্ত হওয়া কোন বুদ্ধিমানের কাজ নয়। ইচ্ছা করলে আল্লাহ মাফ করে দিবেন। কিন্তু মাফের আগে গোনাহের শাস্তি কতদিন ভোগ করতে হয় তা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানেন না।

অতএব ভয় এবং আশা উভয়টাই পরিপূর্ণ রাখতে হবে। ভয় যেরূপ একশত ভাগ রাখতে হবে আশাও তদ্রুপ একশত ভাগ রাখতে হবে। আশা এবং উভয়ের মাঝে ঈমান নিহিত রয়েছে। তাই তো উমর রা. বলেন, যদি হাশরে মাঠে ঘোষণা দেয়া হয় সমস্ত লোক জাহান্নামে যাবে। একজন লোক জান্নাতে যাবে তবে আশা রাখি সে লোকটি আমি উমর হব। আর যদি ঘোষণা দেয়া হয় সমস্ত লোক জান্নাতে যাবে একজন লোক জাহান্নামে যাবে তবে ভয় হয় সে লোকটি আমি উমর হব।

দাঁড়িওয়ালা নবী ১১জন স্ত্রী পেলে আমি কি ১ জন ও পাব না?

অনেক দিন পূর্বে সাহারানপুরের একটি জামাত বাংলাদেশে সময় লাগানোর জন্য আসে। জামাতের সাথে এই অধমেরও কিছুদিন থাকার সুযোগ হয়েছে। একবার আমি জামাতের কয়েকজন বিজ্ঞ সাথীর সাথে দ্বীনের বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করছিলাম। সাথীরা আমাকে বিভিন্ন অমুসলিম দেশের অমুসলিম ছেলেরা কিভাবে ইসলামে দিক্ষীত হচ্ছে এবং

ইসলামকে কতটা মজবুতীর সাথে আকড়িয়ে ধরছে তা বুঝাতে গিয়ে একটি জলন্ত ঈমানদিপ্ত ঘটনা শুনালেন।

একবার (সাহারানপুরে) তাদের এলাকায় একজন ইংরেজ নও মুসলিম যুবক জামাতে এসেছিল। মুখে তার নবীর প্রিয় সুন্নাত দাঁড়ি শোভা পাচ্ছিল। যুবক তার মুসলমান হওয়ার ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে বললেন, আমি ইসলাম গ্রহণ করে আল্লাহর রাস্তায় বের হই এবং জামাতেই দাঁড়ি রেখে দেই। আমার পরিবারে আমি ছাড়া আর কেউ মুসলমান না হওয়ায় আমি বাড়ীতে যাওয়ার পর সকলেই আমাকে ইসলাম ধর্ম ছাড়ার জন্য বিভিন্নভাবে আত্মীয়-স্বজনের মাধ্যমে বুঝাতে লাগলো। কিন্তু আমি ছিলাম আমার সিদ্ধান্তে পাহাড়ের ন্যায় অটল ।

আমার দাদী আমাকে খুব মুহাব্বত করতো। তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করে ব্যর্থ হলেন। পরিশেষে আমার দাদী ক্ষিপ্ত হয়ে বললো, নাতী! তুমি যে দাঁড়ি রেখেছো কেউ তো তোমাকে মেয়ে দিবে না। উত্তরে আমি বললাম, দাদীমা, আমাদের নবী মুহাম্মাদ সা. যদি দাঁড়ি রেখে ১১জন বিবি পেতে পারেন তাহলে আমি তার উম্মত হয়ে একজন কি পাব না? আমার উত্তর শুনে আমার দাদী লা জবাব হয়ে গেল।

পাঠক! এই হলো একজন নও মুসলিমের চরিত্র। যিনি মুসলমান হওয়ার সাথে সাথে দাঁড়ির মত গুরুত্বপূর্ণ আমলকে আকড়িয়ে ধরেছেন। অথচ আমাদের পুরাতন মুসলমানদের অবস্থা হলো দাঁড়ি রাখা আমাদের জন্য লজ্জার ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। আবার অনেকেই নিজেই নিজেই ফতোয়া দেয় যে, দাঁড়ি রাখতে হলে বিবির অনুমতি লাগবে। আবার অনেককে দাঁড়ির কথা জিজ্ঞাসা করলে বলে, বিবাহ করে দাঁড়ি রাখব। হাশরের মাঠে দাঁড়িবিহীন এই চেহারা কিভাবে রাসূলুল্লাহ সা. কে দেখাবেন তা একবার ভেবে দেখেছেন কি? তখন এই সব খোড়া যুক্তি কোন কাজে আসবে না।

শরীয়াতের দৃষ্টিতে এবং চার ইমামের নিকট পুরুষের জন্য দাঁড়ি রাখা ওয়াজিব। দাঁড়ি মুন্ডানো বা কেটে ছেটে নিজের হাতের একে মুষ্টির (চার

আঙ্গুল) কম রাখা হারাম, কবীরা গোনাহ আর মোঁচ এতটুকু ছোট করা সুন্নাত যাতে উপরের ঠোটের কিনারা প্রকাশ পায়। বড় বড় মোঁচ রাখা অমুসলিমদের তরিকা এবং মোঁচ একেবারে মুন্ডানো নিষধ।

প্রিয় পাঠক! দাঁড়ি রাখার মধ্যে ১৭টি উপকার রয়েছে,

১. দাঁড়ি রাখা শিআরে ইসলাম। অর্থাৎ এর দ্বারা মুসলমানদের জাতীয় নির্দশনের পরিচয় পাওয়া যায় এবং শরীয়তের হুকুমের উপর আমল হয়।

২. আল্লাহ তাআলার খিলকাত ও সৃষ্ট বৈশিষ্ট্যকে ঠিক রাখা হয়।

৩. পুরুষ মহিলাদের সামঞ্জস্যতার যোগ্যতা বিদ্যমান থাকে।

৪. চোখের দৃষ্টি শক্তি ঠিক থাকে।

৫. ইমাম ও মুয়াজ্জিন হওয়ার যোগ্যতা বিদ্যমান থাকে।

৬. মুসলমানের সম্মান ও সালাম পাওয়ার যোগ্য বিবেচিত হয়।

৭. চেহারায় নুর চমকাতে থাকে ও চেহারার সৌন্দর্য বৃদ্ধি পেতে থাকে।

৮. অনেক গোনাহের কাজ থেকে বিরত থাকা সহজ হয়ে যায়, কারণ দাঁড়িওয়ালা ব্যক্তিকে শয়তান সহজে অন্যায় কাজে লিপ্ত করতে পারে না। দাঁড়ির কারণে সে ব্যক্তি অবৈধ কাজে অংশগ্রহণ করতেও লজ্জা বোধ করে।

৯. সেভ করার অনর্থক সময় ও অর্থের অপচয় বন্ধ হয়।

১০. ওয়াজিব আদায়কারী হিসাবে দ্বীনদার পরহেজগার এ জাতীয় সম্মানীত উপাধিতে ভূষিত হয়।

১১. একজন মুমিন হিসাবে সহজে পরিচিত হওয়া যায়। নতুবা মুমিন ও কাফিরের মাঝে পার্থক্য খুবই মুশকিল হয়ে যায়।

১২. রাসূলুল্লাহ সা. এর অন্তর মুবারক খুশী করা হয়।

১৩. গুনাহে জারিয়া থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।

১৪. পুরুষের সৌন্দর্য হচ্ছে দাঁড়ি। কারণ পুরুষ জাতি তো সিংহের ন্যায় বাহাদুর। আর সিংহের মুখের শোভা হল দাঁড়ি।

১৫. রাস্তা ঘাটে বা অপরিচিত স্থানে মারা গেলে মুসলমান হিসেবে তার গোসল ও কাফন দাফন নসীব হয় ।

১৬. কবরে মুনকার নাকীরের সুওয়াল জওয়াব সহজ হয়।

১৭. এর দ্বারা হাশরের ময়দানে উম্মত বলে চেনা সহজ হবে এবং হযরত রাসূল স্না. এর সুপারিশ লাভের ওয়াসিলা হবে।

দাঁড়ি না রাখলে ১৭টি ক্ষতি হয়

১. দাঁড়ি মুন্ডালে অথবা এক মুষ্ঠি থেকে ছোট করলে শিআরে ইসলাম তথা মুসলমানদের জাতীয় নির্দশন এবং শরীআতের হুকুম তরক করা হয়।

২. আল্লাহ তাআলার খিলকাত ও সৃষ্ট বৈশিষ্ট্যকে নষ্ট করা হয়।

৩. পুরুষ জাতি মহিলাদের সাদৃশ্য হয়ে যায়, যা শরীয়াতে হারাম ।

৪. চোখের দৃষ্টি শক্তি হ্রাস পেতে থাকে।

৫. সূরাহ ক্বিরআত সহীহ থাকলেও তার আযান ইক্বামত ও ইমামতির যোগ্যতা থাকে না।

৬. মুসলমানদের সম্মান ও সালাম পাওয়ার যোগ্য হয় না।

৭. চেহারার নূর চলে যায় এবং প্রকৃত সৌন্দর্য নষ্ট হয়ে যায়। এ কারণে পারস্যের দাঁড়িবিহীন দূতকে নবী সা. দেখে চেহারা ফিরিয়ে নিয়ে বলেছিলেন যে, তোমার চেহারা এত বিশ্রী বানাতে কে বলেছে? তাছাড়া দাঁড়ি মুন্ডালে অল্প দিনেই তার দাঁড়ি পেকে সাদা হয়ে যায়। যার ফলে তখন দাঁড়ি রাখতে বললেও লজ্জার দরুন তা রাখা মুশকিল হয়।

৮. বিভিন্ন গোনাহ থেকে বাঁচা কঠিন হয়ে যায় এবং সহজে বিভিন্ন গোনাহের মধ্যে জড়িয়ে পড়তে হয়।

৯. সেভ করার মধ্যে অর্নথক সময় ও অর্থের অপচয় হয়।

১০. তার শরাফত বা বুযুর্গী নষ্ট হয়ে যায় এবং মানুষ তাকে ফাসিক, পাপী ও নাফরমান ইত্যাদি বলে স্বরণ করে থাকে।

১১. ঐ ব্যক্তি মুমিন না কাফের তা বুঝা যায় না এবং তার হকও আদায় করা যায় না।

১২. রাসূলুল্লাহ সা. এর অন্তর মোবারকে আঘাত দেওয়া হয়।

১৩. অন্যান্য গুনাহ একবার করলে একবারই গোনাহ লেখা হয় কিন্তু দাঁড়ি না রাখলে সর্বদা গুনাহ লেখা হতে থাকে ।

১৪. পুরুষের সৌন্দর্যের বিকৃতি ঘটে এবং তার গাম্ভীর্যতা শেষ হয়ে যায়।

১৫. দাঁড়িবিহীন লোক রাস্তা ঘাটে মারা গেলে তার গোসল, কাফন, দাফন নিয়ে সমস্যার সৃষ্টি হয়। তাকে শ্মশানে নেয়া হবে কি গোরস্থানে নেয়া হবে। তাও নির্ণয় করা মুশকিল হয়ে যায়।

১৬. কবরে মুনকার নাকিরের সুওয়াল জবাব কঠিন হয়ে যাবে।

১৭. এর দ্বারা হাশরের ময়দানে উম্মত বলে দাবী করা এবং উম্মতে মুহাম্মদী হিসাবে তার পরিচয় দিয়ে শাফায়াতের আশা করাও মুশকিল হবে।

বাদশার করুণ পরিণতি

এক বাদশাহ নিজ মহলে ঘুমিয়ে ছিলেন। হঠাৎ অর্ধরাতে তিনি জাগ্রত হলেন, তখন তার নিজ ধন সম্পদের ভান্ডার দেখার আগ্রহ জাগলো। তাই তিনি তৎক্ষণাৎ চাবি নিয়ে খাঝানার দরজা খুলে তথায় গচ্ছিত ধনভান্ডার সোনা রূপা মনি-মুক্তা দেখতে লাগল। আর মনে মনে বলতে লাগল, এসব ধন রত্ন তো আমার দশ পুরুষের জন্য যথেষ্ট। আল্লাহর নিকট বাদশার এই খিয়াল পছন্দ হলো না। তাই মানুষের শিক্ষার জন্য আল্লাহর কুদরত প্রকাশ পেল।

ঘটনাক্রমে উজির সাহেবও অর্ধরাতে জাগ্রত হলেন এবং ভাবলেন, আমি যে আসরের সময় খাযানার দরজা খুলেছিলাম মনে হয় দরজা খোলা। তিনি গিয়ে ভিতরে প্রবেশ না করে বাহির থেকে খাযানার দরজা লাগিয়ে দিলেন।

ভিতরে যে বাদশাহ আছে তা তিনি ক্ষুণাক্ষরেও জানতেন না। তালা লাগিয়ে উজির চলে গেলেন। ফলে বাদশাহ ভিতরে পড়ে রইল। পরদিন সকাল বেলায় যখন বাদশাহ দরবারে আসলেন না, তখন উজির সাহেব মহলে সংবাদ পাঠালেন। কিন্তু মহল থেকে বলা হল, বাদশাহ অর্ধরাতে মহল থেকে বাহির হয়ে গেছেন। আমাদের জানা নাই তিনি কোথায় আছেন।

অবশেষে অনেক খোঁজা খুজির পরেও বাদশাহের কোন সংবাদ পাওয়া গেল না। এ দিকে বেচারা বাদশাহ দীর্ঘদিন পর্যন্ত খাওয়া দাওয়া না খেয়ে ক্ষুধার পিপাসায় ছটপট করতে করতে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লো। পনের বিশ দিন পর যখন খাযানা খোলা হল তখন বাদশাহকে মৃত অবস্থায় খাযানার ভিতরে পাওয়া গেল। সাথে একটি চিরকুট ও পাওয়া গেল। যাতে লেখা ছিল, যে ব্যক্তি দুনিয়ার ধন সম্পদের সাথে মন লাগাবে তার হাশর ও এমন হবে যেমন আমার হয়েছে।

(সূত্র : তাবলীগের অন্যতম আমীর হযরত মাও. মুফতী ইউসুফ রাহ., এর বয়ান থেকে সংগৃহিত বা শাহনামা হুসনে আখলাক ১৯৯৩ প্রকাশিত হয়েছে।)

নির্জন বাস

এক ব্যক্তি হাসান বসরীর নিকট এসে বলল, হে আবূ সাইদ! আমাদের এলাকায় এক ব্যক্তি সবসময় লোকালয় ত্যাগ করে নির্জন জায়গায় বসে থাকে। আমরা উহার কারণ উদ্ধার করতে পারিনি। পরে একদিন হাসান বসরী তথায় গিয়ে সেই ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করল, মনে হয় তুমি নির্জনতা ভালবাস এবং মানুষের সঙ্গে মিলা মিশা কর না, কিন্তু তার কারণ কি? সে বলল, আমি সব সময় কাজে ব্যস্ত থাকি, তাই মানুষের সাথে মিলা মিশা করতে পারি না।

হযরত হাসান বসরী রহ. বললেন, অমুক জায়গায় হাসান বসরী বসবাস করেন মাঝে মধ্যে তার সাথেও দেখা সাক্ষাৎ করতে পারো। সে বলল, যে

কারণে আমি মানুষের সঙ্গে মিলা মিশা করতে পারি না ঠিক একই কারণে তার সঙ্গে দেখা করতে পারবো না। হযরত হাসান বসরী জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার সেই কাজটি কি? সে বলল, আমি চোখ খুললেই দেখতে পাই আল্লাহ পাকের অসংখ্যা নেয়ামত এবং তার বিপরীতে আমার গোনাহের ইস্তেগফার করতে করতেই আমার সময় শেষ হয়ে যায়। অন্য কোন কাজের ফুরছত পাই না। তার এ কথা শুনে হযরত হাসান রহ. বললেন, হে আল্লাহর বান্দা! তুমি হাসান হতেও বুদ্ধিমান, তুমি নিজের কাজেই মশগুল থাক।

শিশু বুযুর্গ

হযরত আবু আব্বাস মাছরুক বলেন, বসরাতে এক ব্যক্তি তার শিশু কন্যাকে কোলে নিয়ে বড়শী দ্বারা মাছ ধরতে ছিলো। আমি লক্ষ্য করলাম, লোকটি মাছ ধরে একটি পাত্রে রাখছে আর সেই শিশুটি তার অলক্ষে পাত্র থেকে মাছ পানিতে ছেড়ে দিচ্ছে। কিছুক্ষণ পর লোকটি সেই পাত্রের দিকে তাকিয়ে দেখে তাতে একটি মাছও নেই। শিশুটিকে জিজ্ঞাসা করলে সে বলল, আব্বাজান! আপনি কি জানেন না যে নবী করীম সা. ইরশাদ করেছেন যেই মাছ আল্লাহর জিকির হতে গাফেল থাকে সেই মাছই বড়শীতে আটকায়। নাবালেগ শিশুর কচি মুখে আল্লাহর নবীর এই বাণী শুনে লোকটির চোখে পানি এসে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে যে মাছ ধরা বন্ধ করে চলে গেলো।

পূণ্যের পথে

এক বুযুর্গ একবার নরম বালিশে মাথা রেখে ঘুমাচ্ছিলেন। তিনি স্বপ্নে দেখলেন এক ব্যক্তি এসে তাকে বলল, পড়। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন কি পড়ব? সে বলল, এই বাক্যগুলো পড়।

يا حرانك ان توسدلينا + وسدت بعد الموت هنلم الجندل

فاعمل لنفسك فى حياتك صالحا + فلتندمن غدا اذا لم تفعل

ভাবার্থ : হে স্বাধীন ব্যক্তি! দুনিয়াতে তুমি যদি নরম বালিশে আরাম কর, তবে আখেরাতে শক্ত পাথরের বালিশ পাবে। ইহকালে নিজের জন্য নেকী হাসিল কর, অন্যথায় পরকালে তোমাকে আক্ষেপ করতে হবে।

এক বুযুর্গ বলেন, আগের জমানায় মানুষের অন্তর স্বেচ্ছায় নেক আমলের প্রতি অগ্রসর হত। কিন্তু বর্তমান যুগের মানুষের অন্তরসমূহ নেক আমলের প্রতি আগের মত সে উৎসাহ নেই। সুতরাং এখন অন্তরকে জোর করেই নেক আমলে অভ্যস্ত করতে হবে।

এক বুযুর্গ বলেন, হে আদম সন্তান! তুমি যদি মনে কর যে, সকল সময় সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও আরাম আয়েশের মধ্যেই নেক আমল করবে তবে উহা কখনো সম্ভব হবে না। ঐ ব্যক্তি প্রকৃত মোমেন, যে ব্যক্তি সুখ-দু:খ সব সময় আল্লাহ্ পাকের ইবাদত ও আনুগত্যে অগ্রসর হতে থাকে । মোমেনের স্বভাব হল, যতক্ষণ তার দোয়া কবুল না হবে ততক্ষণ সে প্রকাশ্যে ও গোপনে রাব্বানা! রাব্বানা! বলতেই থাকবে। হযরত আবু রবীয় বলেন, তুমি যে অবস্থায় আছ সেই অবস্থায়ই আল্লাহকে ডাকতে থাক। সুস্থ হওয়ার পর নেক আমল করব, এমন ধারণা বোকামী ছাড়া কিছুই নয়।

আল্লাহর রহমতে সমাপ্ত

কুড়ানো মুক্তা

মুফতী জালালুদ্দিন মিয়াজি



The Bright
Design Zakir
Ph:01715787586

মাহ্মুদিয়া লাইব্রেরী
ইসলামী টাওয়ার (দোকান নং-১০)
১১/১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০